بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সবুজ পাতার বন

ilmDrive

www.ilmDrive.com

প্রকাশনী কর্তৃক অনুমোদিত

সবুজ পাতার বন

শাইখ আবদুল আযীয আত-তারিফী

ইংরেজী থেকে অনুবাদ
সীরাত অনুবাদক টীম

সম্পাদনা, ভাষারীতি সংশোধন ও বিন্যাস
সাজিদ ইসলাম

শার'ঈ সম্পাদনা ও পৃষ্ঠাসজ্জা
শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

প্রচ্ছদ
আনিকা তুবা

সীরাত পাবলিকেশন

সবুজ পাতার বন

গ্রন্থস্বত্ব © সাজিদ ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি-২০১৮

ISBN: 978-984-34-3679-5

প্রকাশক

সীরাত পাবলিকেশন

www.facebook.com/seeratpublication
Email: seeratpublication@yahoo.com

প্রধান পরিবেশক

মাকতাবাতুল বায়ান
শপ#৩১৫, দ্বিতীয় তলা, ৩৮/৩-কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: +৮৮ ০১৭০০৭৪৩৪৬৪

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
sijdah.com

মূল্য : ২৮০৳ মাত্র

“

শাইখ আবদুল আযীয আত-তারিফী। আপনার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ আমাদের হৃদয়গুলোতে বসিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে অবিচল রাখেন, জান্নাতে যেন আমাদেরকে প্রতিবেশী করেন।

”

আমাদের সবুজ পাতার বন

আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ আলেমদেরকে আকাশের তারার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যখন পথ হারিয়ে ফেলে তখন আকাশের তারা দেখে দিক ঠিক করে নেয়। ঠিক তেমনি আলেমদের বৈশিষ্ট্যও এমন হবে যে, তাঁদেরকে দেখেই উম্মাহ সঠিক পথে পরিচালিত হবে। ইলম অনেকেই অর্জন করে। কিন্তু সে ইলমের সাথে প্রজ্ঞার মিশেলে ইলমের গভীর থেকে গভীরে গিয়ে মণিমুক্তা আহরণ করতে পারেন খুব অল্প কিছু মানুষ। যারা সেটা পারেন তাদের মুখনিঃসৃত একটা বাক্যই শ্রোতার অন্তরে গিয়ে আঘাত করে, চিন্তার জগতে নিয়ে আসে আমূল পরিবর্তন। তারা যেন অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বলে তারা, শত আলোকবর্ষ দূর থেকেও দৃশ্যমান, পথিকের হিদায়াতের উৎস।

আল্লাহর রাসূলকে ﷺ একটা চমৎকার গুণ দেওয়া হয়েছিল, জাওয়ামি আল-কালাম —অল্প কথায় গভীর ভাব ব্যক্ত করার ক্ষমতা। আমাদের এ যুগে রাসূলের সেই গুণটি যারা সংরক্ষণ করেছেন তাঁদেরই একজন শাইখ আবদুল আযীয আত-তারিফী। তাঁর কথাগুলো কুরআনের ভাষায় যেন সূরা ইবরাহীমের সেই একেকটি বৃক্ষ, সুদৃঢ় যার মূল, আকাশছোঁয়া তার শাখা-প্রশাখা...

"পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।" (সূরাহ ইবরাহীম ১৪: ২৪)

আর আল্লাহ এমনসব বাক্যের গাঁথুনিতেই মুমিনদের হৃদয়কে মজবুত করেন।

"আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে।" (সূরাহ ইবরাহীম ১৪: ২৭)

আমরা শাইখের এমন সব অমূল্য বাক্য দিয়ে একটি বন সাজিয়েছি, সবুজ পাতার বন। শাইখের হৃদয়ে শিহরণ জাগানো আর ঈমানে স্ফুলিঙ্গ জ্বালানো কথামালা এই বনের এক একটি বৃক্ষ। আছে সুশোভিত ডালপালা, ফলফলাদি আর ফুলের সুবাস।

দ্বীনের ইলম যখন আজ আমাদের মাঝে বাক্সবন্দী হয়ে কিছু আচার অনুষ্ঠান আর ব্যক্তিগত আমলের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, শাইখ তাদের মধ্যে একজন যিনি আমাদেরকে বাক্সের বাইরে চিন্তা করতে শেখান। যিনি আকীদাকে কেবল তত্ত্বে নয়

জীবনেও বাস্তবায়নের কথা বলেন, যিনি উম্মাহর দুর্দশার কথা বলেন, উম্মাহর আজকে এই লাঞ্ছনা আর অপদস্ততার কথা বলেন। সেকুলারিজম থেকে পাশ্চাত্যের লিবারেলিজম, আলেমদের মানহাজ থেকে সাধারণের ধ্যান ধারণা, পশ্চিমা মডারেট ইসলামের মুখোশ উন্মোচন, সবখানেই শাইখের কলম বিচরণ করে এক দৃঢ় প্রত্যয়ে। প্রিয় শাইখের সেই হৃদয় জাগানিয়া আর শিহরণ তোলা শব্দগাঁথনি যেন এই বাগানের এক একটি সুবজ পাতা।

আমরা চেয়েছি শাইখের ইলম আর প্রজ্ঞা থেকে যেন বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমরা উপকৃত হয়। সত্যি সত্যি যেন মজবুত কথামালার মাধ্যমে আমাদের ঈমানে মজবুতি আসে। কারো ছোট ছোট মালফুজাতকে একত্রিত করে অধ্যায়ভিত্তিকভাবে সাজিয়ে বইয়ে রূপদান করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ কাজ। সেই কাজটি অবশেষে পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি সেজন্য আমরা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে শোকরিয়া জানাই। এর পেছনে যত আল্লাহর বান্দার মেহনত আর হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসা জড়িয়ে আছে সেই নামগুলো আল্লাহর কাছেই পেশ করলাম, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যেন তাদের সবার উপর দয়া করেন।

দিনশেষে আমরা সবাই মানুষ। ভুলত্রুটি থেকে আমরাও মুক্ত নই। অন্তত এতটুকু দাবি করতে পারি যে, আমরা আমাদের চেষ্টার কোন কমতি রাখিনি। তারপরও মনের অজান্তে যা কিছু ভুলত্রুটি আশা করি তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে।

আর সবশেষে পাঠক আমাদের সবুজ পাতার বনে এসে নিজেকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে আবিষ্কার করবেন, কিংবা নিজেকে আবার নতুনভাবে সাজিয়ে নিবেন, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

বিনীত
সাজিদ ইসলাম
সম্পাদক

বিন্যাস

বিশ্বাসের ভিত্তি	১১
সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব	৩৭
ইবাদাত ও আত্মশুদ্ধি	৫৯
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ	৭৯
অন্তরের ব্যাধিসমূহ	১০১
চিন্তার স্বাধীনতা নয়, নফসের শিকল	১২১
মূল্যবান উপদেশ	১৩৩
শাইখ পরিচিতি	১৫৬

বিশ্বাসের ভিত্তি

বিশ্বাসের একটি ভাষা আছে। সবাই সেই ভাষা বুঝতে পারে না। যারা পারে তারা আল্লাহর আনুগত্যে নিজেদেরকে সঁপে দেয়। আর বাকিরা বিদ্রোহ করে বসে। দ্বীন ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেসব মূলনীতি আছে সেসবে বিশ্বাস স্থাপন, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কর্মপদ্ধতির ইলম অর্জন ছাড়া বিশ্বাসের সেই ভাষা বোঝা সম্ভব নয়। তাই এই বইয়ের শুরুটা হচ্ছে বিশ্বাসের সেসব ভিত্তি দিয়ে যা দ্বীনের উপর অবিচল হয়ে থাকার রসদ জোগাবে। আল্লাহর সুন্নাহ, ঈমান-কুফরের স্বরূপ, সকল মতাদর্শের উপর দ্বীন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণপুঞ্জি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একজন দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলে আল্লাহ্ একটি জনপদকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন।

অনেক ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবদ্দশায় মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। খিলাফাহর যুগে তো কয়েকটি গোষ্ঠীই সম্পূর্ণভাবে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলো। এটা কখনোই ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, আর না কখনো পারবে। ইসলাম কখনো কমে না, শুধুই বাড়ে। আল্লাহর সুন্নাহ হলো, একজন দ্বীন থেকে বের হয়ে গেলে তার স্থলে পুরো একটি মুসলিম জনপদ নিয়ে আসা।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে শীঘ্রই আল্লাহ তার স্থলে এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন আর তারাও তাঁকে ভালোবাসবে; তারা হবে মু'মিনদের প্রতি বিনয়-নম্র ও কাফিরদের প্রতি কঠোর; তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না।" (সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৫৪)

আল্লাহর রহমত কখনো স্থানের বিবেচনায় নাযিল হয় না, বরং তা তাদের কাছেই আসে যারা কৃতজ্ঞতার সাথে সেই রহমতের কদর করে।

সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান থেকেও আল্লাহ চাইলে রহমত উঠিয়ে নিতে পারেন যদি সেই রহমতের শুকরিয়া আদায় করা না হয়। রাসূল ﷺ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রহমত- রাহমাতুল্লিল আলামিন। মক্কার লোকেরা সেই রহমতের কদর করতে পারেনি, তাই আল্লাহ সেই রহমতকে মদীনায় স্থানান্তরিত করে দিলেন। আল্লাহর রহমত কখনো স্থানের বিবেচনায় নাযিল হয় না, বরং তা তাদের কাছেই আসে যারা কৃতজ্ঞতার সাথে সেই রহমতের কদর করে।

মানুষ যা নিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে অহংকার করে আল্লাহ সেটা দিয়েই তাকে শাস্তি দেন।

মানুষ যা নিয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে অহংকার করে আল্লাহ সেটা দিয়েই তাকে শাস্তি দেন। ফির'আউন তার তলদেশে বহমান নদীসমূহ নিয়ে অহংকারী হয়েছিলো।

"আর এসকল নদী যা আমার তলদেশে বয়ে যাচ্ছে।" (সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৫১)

আর তাই আল্লাহ তাকে বহমান সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন।

"সমুদ্র তাদের ওপর চড়াও হলো আর তাদের ডুবিয়ে দিলো।" (সূরাহ ত্বা-হা ২০:৭৮)

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ বান্দার জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হলো আল্লাহ কর্তৃক বান্দার প্রতি সতর্কবার্তা। যে সত্ত্বা সাময়িকভাবে নক্ষত্রের আলো ঢেকে দিলেন, তিনি তা চিরতরে করতে সক্ষম। একটি গ্রহের অবস্থা যিনি পাল্টে দিলেন, এর অধিবাসীদের অবস্থাও তিনি পাল্টাতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহর এই নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, সতর্ক হোন।

একটি মুসলিম দেশে বিপদ নাযিল করে আল্লাহ অন্যান্য দেশগুলোকে পরীক্ষা করেন

একটি মুসলিমপ্রধান দেশে বিপদ নাযিল করে আল্লাহ অন্যান্য দেশগুলোর ইসলামকে পরীক্ষা করেন। তারা কি জীবিত না মৃত তা দেখে নেন। কারণ মুসলিম উম্মাহ এক দেহের মতো। দেহের একটি অঙ্গ যদি অন্য অঙ্গের ব্যথা অনুভব না করে, তাহলে সেটি মাদকাসক্ত না হয় মৃত। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে আল্লাহ তাঁর অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে অন্য জাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করে দেন। শামের হাজারো মানুষের ওপর আরোপিত অবরোধ আর কুকুর-বিড়াল খাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ফাতওয়া প্রমাণ করে যে এমন একটি প্রতিস্থাপনের সময় চলে এসেছে। যারা তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ ছিলো, তারা সাহায্য না করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ধ্বংস হওয়ার যোগ্য বলে প্রমাণ করেছে।

কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না।

ঈমান যদি বংশ পরম্পরায় পাওয়া যেতো, তাহলে নূহ (‘আলাইহিসসালাম) এর পুত্র ঈমান লাভ করতো। আর কুফর যদি বংশ পরম্পরায় পাওয়া যেতো, তাহলে ইবরাহীম (‘আলাইহিসসালাম) তাঁর পিতা আযারের মতো কাফির হতেন।

“কোনো ভার বহনকারীই অন্যের গুনাহর ভার বহন করবে না।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৬৪)

মাজলুমের দু’আ একটি নির্ধারিত সময়ে কবুল হবেই।

মাজলুমের দু’আ কবুল হবেই এবং এর সময়ও নির্ধারিত। একটি হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন, “আমার ক্ষমতার কসম, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো, যদিও তা কিছু সময় পরেও হয়।” (মুসনাদ আহমাদ: ৮০৩০)

নির্ধারিত সময়টি আল্লাহর ইচ্ছায় ঠিক হয়। যালিমের ইচ্ছায় তো নয়ই, মাযলুমের ইচ্ছায়ও নয়।

কারো অপেক্ষায় থেকে কোন কাজ বন্ধ থাকে না।

ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীস সহীহ্। তিনি জন্ম নেবেন। তবে সেটা কবে ও কোথায় এব্যাপারে কিছু বর্ণিত নেই। 'মুনতাযার' (প্রতীক্ষিত) বলে তাঁর কোনো নাম নেই। কারণ আমরা কারো অপেক্ষায় কাজ করা বন্ধ রাখি না। এখন যে কুরআন অনুযায়ী আমরা কাজ করি, ইমাম মাহদী, ঈসা (আলাইহিসসালাম) ও তাঁদের সঙ্গীরাও সেই কুরআন অনুযায়ীই কাজ করবেন।

একটা মতাদর্শ অনুসরণ করে দুনিয়াতে কেউ আরামে থাকলেই সেই মতাদর্শ সঠিক হয়ে যায় না।

কেউ কেউ প্রশ্ন তোলেন, কাফেররা যদি বাতিলই হয় তাহলে তারাই কেন পৃথিবীতে রাজত্ব করছে? তারাই তো সবার চেয়ে সুখে আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, জীবন উপভোগের উপকরণ সবই তো তাদের! মনে রেখো, একটা মতাদর্শ অনুসরণ করে দুনিয়াতে কেউ আরামে থাকলেই সেই মতাদর্শ সঠিক হয়ে যায় না। কাফিরও শান্তিতে থাকতে পারে, মুমিনও কষ্ট পেতে পারে। কিন্তু সফলতা হলো দিনশেষে আল্লাহ্‌র চোখে সফল হওয়া। কাফেরদের বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছেন,

"কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরের জন্য খুলে দেয়, তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব।" (সূরাহ্ আন-নাহল ১৬:১০৬)

যার উপর আল্লাহ্‌র গযব তার দুনিয়ার সফলতা কী কাজে আসবে?

আল্লাহ্ আপনাকে কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত করেছেন কারণ এর চেয়ে উত্তম জিনিস তিনি আপনার জন্য জমিয়ে রেখেছেন।

আল্লাহ্ কাউকে হয়তো কোনো জিনিস থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে কষ্টে নিপতিত করবেন। যেমন মূসার (আলাইহিসসালাম) সাথে হয়েছিলো।

"আগে থেকে আমি তাকে (মূসা) ধাত্রী-স্তন্য পান করা থেকে বিরত রেখেছিলাম।" (সূরাহ্ আল-ক্বাসাস ২৮:১২)

কারণ তিনি আপনার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু জমিয়ে রেখেছেন। আপনাকে বঞ্চিত না করা হলে আপনি সেই কম ভালো জিনিসটি নিয়েই মেতে থাকতেন।

যেভাবে আল্লাহ্ মূসার (আলাইহিসসালাম) প্রসঙ্গে বলেছেন, "এরূপে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম যাতে তার চোখ জুড়ায়।"

(সূরাহ্ আল-ক্বাসাস ২৮:১৩)

ভূমিকম্পের মাধ্যমে ভূমিকে যিনি কাঁপিয়ে দিলেন, তিনি এই ভূমির ওপর বিচরণশীল যে কাউকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম।

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি হলো ভূমিকম্প। এটি এক আসমানী বার্তা বহন করে। এই বার্তার সবচেয়ে ভয়াবহ শিক্ষাটা হলো: এই ভূমিকে যিনি কাঁপিয়ে দিলেন, তিনি এই ভূমির ওপর বিচরণশীল যে কাউকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম।

“আর আমি কেবল সতর্কবার্তা হিসেবেই নিদর্শনসমূহ পাঠিয়ে থাকি।” (সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৫৯)

আল্লাহর সুন্নাহ হলো ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেলে সেই বস্তুকে ধ্বংস করা।

কুফরের ভিত্তিতে পরিচালিত জাতি যদি শুরু থেকেই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে এটি দীর্ঘদিন টিকলেও টিকতে পারে। কিন্তু কোনো জাতি যদি শুরুতে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরে কুফরের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে, তাহলে এটি বেশিদিন টিকবে না। কারণ আল্লাহর সুন্নাহ হলো ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গেলে সেই বস্তুকে ধ্বংস করা।

নবীজীর নামে কেউ কুৎসা রটালে সেটা বলে বেড়ানো উচিত নয়।

নবীজীর ﷺ নামে কেউ কুৎসা রটালে, রটনাকারী সম্পর্কে মানুষকে জানানোর জন্যও সেসব বলে বেড়ানো উচিত না। কারণ অশ্লীলতার প্রসারের চেয়ে নবীজীর নামে কুৎসার প্রসার আল্লাহর কাছে বেশি ঘৃণিত। বরং যিনি এসব কুৎসার জবাব দিতে সক্ষম, তাঁকে বেশি বিস্তারিত না বলে অল্প কথায় মূল বিষয় জানিয়ে দিতে হবে।

আল্লাহর বাণী গতকাল যা ছিলো, আজও তা-ই আছে, আগামীকালও তা-ই থাকবে।

মানুষের মতামতকে অন্ধ অনুসরণ করলে তাদের পিছু পিছু ছুটে আজ এদিকে তো কাল সেদিকে যেতে হয়। আর আল্লাহর হুকুমের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখলে দৃঢ়তা আসে। কারণ আল্লাহর বাণী গতকাল যা ছিলো, আজও তা-ই আছে, আগামীকালও তা-ই থাকবে।

যাদের সামর্থ্য আছে তারা যদি মজলুমের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসন্ন।

বিপদগ্রস্ত কোনো জাতি যদি সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে আল্লাহ সবচেয়ে সামর্থ্যবান ব্যক্তিটির প্রতি আযাব পাঠাবেন। আর যদি সে পূর্বে থেকেই যালিম হয়ে থাকে, তাহলে তার শাস্তি হবে অন্যদের চেয়েও কঠিন।

“যদি তোমরা নবীকে সাহায্য না করো, তাহলে আল্লাহ তো তাঁকে ইতোমধ্যেই সাহায্য করেছেন।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৪০)

আল্লাহর আইন সেকেলে নয়।

তারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে না, কারণ এটি নাকি যুগের সাথে মানানসই না! ঈসা ইবনে মারইয়াম (আলাইহিসসালাম) তো তাদের অনেক পরে আসবেন এবং তখন আল্লাহর আইন দিয়েই শাসনকার্য পরিচালিত হবে। কাজেই সমস্যাটা যুগের না, সমস্যা হলো যারা শাসন করছে তাদের।

কোন জালিমকে বেশি বাড়তে দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। তার পতন আসন্ন।

আল্লাহ কোনো জালিমকেও উঁচুতে তুলে ধরতে পারেন। কিন্তু এর কারণ যালিমের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা নয়। বরং তাকে উঁচু জায়গা থেকে আছড়ে ফেলাটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং কোন জালিমকে বেশি বাড়তে দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। তার পতন আসন্ন।

আল্লাহ যদি জুলুমের কারণে পাহাড়কেও শাস্তি দেন তাহলে জুলুমবাজ মানুষের কী অবস্থা হবে?

হাদীসে এসেছে "একটি পাহাড় যদি অন্যটির প্রতি সীমালঙ্ঘন করতো, তাহলে সীমালঙ্ঘনকারী পাহাড়কে আল্লাহ জমিনে মিশিয়ে দিতেন।" যালিম যদি পাহাড়ও হয়, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেন। তাহলে যেসব মানুষ আর জাতিগোষ্ঠীগুলো জমিনে জুলুমের ছাপ রেখেই চলেছে তাদের কী পরিণতি হবে?

হৃদয়কে আল্লাহর প্রশংসায় ব্যস্ত রাখার নামই তাওহীদ ও প্রকৃত স্বাধীনতা।

হৃদয় কারো না কারো প্রশংসায় রত থাকবেই। একে নফসের প্রশংসায় ব্যস্ত রাখা হলো অহংকার। অন্যের প্রশংসায় ব্যস্ত রাখা হলো কুফর এবং দাসত্ব। আর একে আল্লাহর প্রশংসায় ব্যস্ত রাখার নামই তাওহীদ ও প্রকৃত স্বাধীনতা।

জীবনকে যে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, সে কোনো দুঃখকষ্ট বা মৃত্যুর পরোয়াই করে না।

জীবনকে যে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, সে কোনো দুঃখকষ্ট বা মৃত্যুর পরোয়াই করে না। কারণ সেটা তো তার মালিকানাধীন নয়, আল্লাহর মালিকানাধীন।

"তারা বললো, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ওপর আমরা তোমাকে কক্ষনো প্রাধান্য দেব না। কাজেই তুমি যা করতে চাও তাই করো। কেননা তুমি কেবল এ পার্থিব জীবনেই কর্তৃত্ব খাটাতে পারো।" (সূরাহ ত্বা-হা ২০:৭২)

আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে সেই আল্লাহকে অমান্য করা বিস্ময়কর কুফরি !

যারা বলে ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখা উচিত, তারা হয় আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে না, অথবা নিজেকে আল্লাহর সৃষ্টি মনে করে না, আর নয়তো বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। কারণ যুক্তি বলে যে, সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টাই সবচেয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন। মানুষকে আর সে মানুষ যে দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সেটা সৃষ্টি করলেন আল্লাহ। এখন সে-ই আল্লাহকে বলছে, "আমাদের দুনিয়ায় আপনার দ্বীনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই!"

"মানুষ ধ্বংস হোক! সে কেমন কুফরিকারী!" (সূরাহ আবাসা ৮০:১৭)

"তিনি শুক্রকীট থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে সেজে বসলো।" (সূরাহ আন-নাহ্‌ল ১৬:৪)

আল্লাহ জালিমের পতন ঘটানোর আগে তার ধ্বংসের কারণকেই তার কাছে প্রিয় বানিয়ে দেন।

আল্লাহ যখন কোনো জালিমের পতন ঘটানোর ইচ্ছা করেন, তখন তার ধ্বংসের কারণকেই তার জন্য প্রিয় বস্তু বানিয়ে দেন। আল্লাহ মূসার (আলাইহিসসালাম) মাধ্যমে ফেরাউনকে ধ্বংস করার আগে মূসা (আলাইহিসসালাম) তার ঘরেই পরম যত্নে লালিত পালিত হয়েছেন।

"ফির'আউনের স্ত্রী বললো, 'এ শিশু আমার ও তোমার চক্ষুশীতলকারী, তাকে হত্যা কোরো না।'" (সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৯)

রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা দেন নি।

ইতিহাসে যত শহর বিজিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে মহান হলো মক্কা। যিনি তা জয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মানবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তা ঘটেছিলো সকল মাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে তথা রমযানে এবং ঘটেছিলো বছরের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ দিন- রমযানের শেষ দশ দিনে। শ্রদ্ধাভক্তির এত কারণ একত্রিত হবার পরও এর বিজেতা একে জাতীয় দিবস বলে ঘোষণা করেন নি।

যাদের জাতীয় দিবস যত বেশি, তাদের পতন তত দ্রুত ঘটেছে।

জাতীয় দিবসগুলো অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা হতে নিরাপদ নয়, আর না সেগুলো জনতাকে তাদের সরকারের সঙ্গে একত্রিত করতে পারে। মিশরে দশ দিনের জাতীয় ছুটি ছিলো, তিউনিসিয়ায় ছিলো সাত দিনের আর লিবিয়াতে ছিলো পাঁচ দিনের। যাদের জাতীয় দিবস যত বেশি, তাদের পতন তত দ্রুত ঘটেছে।

জালিমরা ধ্বংসের পথকেই মুক্তির পথ ভেবে বসে।

আল্লাহ্ জালিমদেরকে এমনভাবে অন্ধ করে দেন যে ধ্বংসের পথগুলোকেই তারা মুক্তির পথ ভাবে। আল্লাহ মূসাকে (আলাইহিসসালাম) পথ করে দেওয়ার জন্য সাগর দ্বিখণ্ডিত করেন। ফির'আউন এটাকে ভেবেছিলো মূসাকে ধাওয়া করার পথ, অথচ এ পথেই নিহিত ছিলো তার ধ্বংস।

আল্লাহ যাকে স্মরণীয় করেন তার স্মৃতি কখনো মুছে যায় না।

লোকে যাকে স্মরণীয় মানে, লোকেদের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার স্মৃতিও মুছে যায়। আর চিরঞ্জীব আল্লাহ যাকে স্মরণীয় করেন, তার স্মৃতি কখনো মোছে না। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাকে আসমানবাসী আর জমিনবাসী সবার হৃদয়ে সম্মানিত করে রাখেন।

আল্লাহ বান্দাকে বিপদে ফেলেন বান্দার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে।

আল্লাহ্ একটি বিপদকে আরেকটি বিপদের মাধ্যমে সরিয়ে দেন, যদিও তিনি তা না করেও বিপদ সরিয়ে দিতে সক্ষম। তিনি এমনটা করেন (মুমিন ও মুনাফিকের) সারির মাঝে পার্থক্য করতে এবং বান্দার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে।

"আল্লাহ চাইলে (তোমাদের মাধ্যম ছাড়াই) তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু (তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের হুকুম দিয়েছেন) তোমাদের এক দলকে অপর দলের দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৪)

দাসত্বের বৈশিষ্ট্য হলো আশা আর ভয়।

দাসত্বের বৈশিষ্ট্য হলো আশা আর ভয়। মানুষ যার বান্দা হয়, তার শাস্তিকে সে ভয় করে আর তার থেকে পুরস্কারের আশা রাখে। সে অনুযায়ী এবার চিন্তা করে দেখুন, আপনি কার দাসত্বে নিয়োজিত আছেন।

আল্লাহ কুরআনে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

মানুষকে মুমিন ও কাফির এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা আল্লাহ্র নির্দেশ।

"তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মাঝে কেউ (হয়ে গেছে) কাফির আর কেউ মুমিন।" (সূরাহ আত-তাঘাবুন ৬৪:২)

তাই তৃতীয় লিঙ্গ আবিষ্কার করতে যাওয়া যেমন ফিতরাতের বিকৃতি, মুমিন ও কাফিরের মাঝে তৃতীয় শ্রেণী খুঁজতে যাওয়াও শরি'আহর বিকৃতি।

আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তুচ্ছ জিনিস থেকেও বিরাট কার্য সমাধা হয়ে যায়।

“সে (মূসা) বললো, এটা আমার লাঠি, আমি ওতে ভর দেই, এর সাহায্যে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝেড়ে দেই আর এতে আমার আরো অনেক কাজ হয়।” (সূরাহ ত্বা-হা ২০:১৮)

তাঁর লাঠিটি মেষপালের জন্য পথ দেখানোর মাধ্যম থেকে মানুষের হিদায়াতের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তুচ্ছ জিনিস থেকেও বিরাট কার্য সমাধা হয়ে যায়।

আল্লাহর বিধান ছাড়া কোনকিছুতেই বান্দাদের সংশোধন হবে না।

মক্কার মুশরিকরা খেজুর দিয়ে মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। ক্ষুধা লাগলে আবার সেটাই খেয়ে ফেলতো। পশ্চিমা গণতন্ত্র হলো মানুষের হাতে বানানো সেরকমই একটি খেজুর মূর্তি। যখন এর কাছে উপকার পাওয়া যায়, সবাই এর উপাসনা করে, আর যখন ক্ষুধা লাগে, তখন একে খেয়ে ফেলে। আল্লাহর বিধান ছাড়া কোন কিছুতেই বান্দাদের সংশোধন হবে না।

"আল্লাহ ছাড়া কোন বিধানদাতা নেই”। (সূরা ইউসুফ ১২:৪০)

দুইজন জালিমের মধ্যে আল্লাহ বড় যালিমকেই আগে ধ্বংস করেন।

এক জালিম আরেক জালিমের ওপর চড়াও হলে তাদের মধ্যে একজন মাজলুম হয়ে যায়। আল্লাহ তখন বড় জালিমকে ধ্বংস করে ছোট জালিমকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন।

“সময়কাল যদি নির্ধারিত না থাকতো, তবে তাদের ওপর শাস্তি অবশ্যই এসে পড়তো। তা তাদের ওপর অবশ্যই আসবে আকস্মিকভাবে, তারা (আগেভাগে) টেরও পাবে না।” (সূরাহ আল-আনকাবূত ২৯:৫৩)

যে আল্লাহকে যত বেশি জানবে তার ইখলাসের স্তর তত বাড়বে।

বান্দা তার রব সম্পর্কে যত জানবে, তার কাজেকর্মে ইখলাসের প্রভাব তত বাড়বে। কম জ্ঞানী ব্যক্তির নিয়্যাতে কিছুটা সমস্যা থাকলেও আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু একজন আলেমের নিয়্যাত পাক্কা না হলে তিনি পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারেন।

তাওহীদের ওপর ঐক্যবদ্ধ হলেই মুক্তি সম্ভব।

উম্মাহ যদি তাওহীদ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতো, তাহলে এর ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেতো। কারণ এটা অন্যসব মতপার্থক্য থেকে মুক্তিকে সহজ করে দেয়। যদি

দেখেন যে উম্মাহ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কলহে লিপ্ত, তাহলে বুঝবেন যে তারা তাওহীদের সঠিক জ্ঞান পায়নি।

মুসলিমদের নির্যাতিত হওয়ার কারণ জাতি রাষ্ট্রের নাম দিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিভক্ত হয়ে যাওয়া।

কাফিরদের রাষ্ট্রগুলো সেখানকার সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে রাখে। তাদের এই সাহস পাবার একমাত্র কারণ হলো জাতি রাষ্ট্রের নাম দিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিভক্ত হয়ে যাওয়া। ঐক্যবদ্ধ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীও শতধাবিভক্ত বিশাল জনগোষ্ঠীর চেয়ে শক্তিশালী হয়।

আধুনিক যুগের মূর্তিপূজা হলো বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের অনুসরণ।

জাহিলি যুগের শির্ক ছিলো মূর্তিপূজা (idolatory) আর আধুনিক যুগের শির্ক হলো বিভিন্ন ভ্রান্ত তন্ত্র-মতবাদ-ইজম (ideologies)।

কেউ একই সাথে সত্য আর মিথ্যাকে ভালোবাসার দাবি করতে পারে না।

ঈমান এবং বাতিল, আর বাতিলের অনুসারীদের প্রতি ভালোবাসা কোন হৃদয়ে একত্রে থাকতে পারে না। কারণ, হাদীসে কোন অন্যায় দেখে তার বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ঈমানের পরিচয় বলা হয়েছে সেটা মন থেকে ঘৃণা করা। যার অন্তরে সেই ন্যূনতম ঘৃণাবোধটুকুও হারিয়ে যায়, তার অন্তর থেকে ঈমানও বেরিয়ে যায়।

“...আর যে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেছে সেও মুমিন। এর পরে আর সরিষাদানা পরিমাণ ঈমানেরও অস্তিত্ব নেই।” (সহিহ মুসলিম: ৫০)

শেষ জামানায় সমগ্র মুসলিম জাতি আবারো ঐক্যবদ্ধ হবে।

দলিল থেকে যা মনে হয় তা হলো শেষ জামানার মহাযুদ্ধের আগে মুসলিম দেশগুলো একই ভূমিতে পরিণত হবে। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে, “সিরিয়া হবে মুমিনদের জড়ো হওয়ার স্থান।” এটি সমগ্র উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রমাণ।

জেনে কবিরা গুনাহ করার চেয়ে শারি’আহর অংশ ভেবে সগিরা গুনাহ করা বেশি গুরুতর।

হারাম জেনে কবিরা গুনাহ করার চেয়ে শরি’আহর অংশ ভেবে সগিরা গুনাহ করা বেশি গুরুতর। সগিরা গুনাহকে শরি’আহর অংশ ভাবাটাই কবিরা গুনাহ।

যে জাতি ঈমান আনার পর আবার কুফরে ফিরে যায় আল্লাহ্ সেই জাতির ওপর আযাব নাযিল করেন

কোনো জাতির মাঝে মহাবিধ্বংসী আযাব নাযিলের কারণ হলো তাদের মাঝে ঈমানের পর কুফর প্রকাশ পাওয়া।

"অকৃতজ্ঞতা ভরে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে তাদেরকে আমি এই শাস্তি দিয়েছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞদের ছাড়া আর কাউকে এমন শাস্তি দেই না।"

(সূরাহ্ সাবা ৩৪:১৭)

মানুষের মাঝে অনেকে আছে যারা দুই ইলাহের উপাসনা করে; একজন আসমানে, আরেকজন জমিনে।

যে বলে 'ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই', সে মূলত দুই ইলাহের উপাসনা করে; একজন আসমানে, আরেকজন জমিনে। যে সত্যিকার অর্থেই এক আল্লাহর উপাসনা করে তার মূলমন্ত্র হবে,

"বলুন, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।'" (সূরাহ্ আল-আন'আম ৬:১৬২)

আল্লাহর হুকুম অমান্যের কারণে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মুসলিমরা আজ লাঞ্ছিত।

সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মুসলিমরা লাঞ্ছিত হচ্ছে, কারণ তারা আল্লাহর হুকুমসমূহ অমান্য করেছে। তাই তারা আল্লাহর নজরে নীচ হয়ে গেছে, আর আল্লাহ তাদেরকে শত্রুদের নজরে নীচ করে দিয়েছেন।

বান্দা সত্য উচ্চারণের সময় আল্লাহই তাকে দৃঢ়পদ রাখেন।

বান্দা সত্য উচ্চারণের সময় আল্লাহই তাকে দৃঢ়পদ রাখেন। না হলে সে দুর্বল, ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তই হয়ে থাকতো।

—মূসা ('আলাইহিসসালাম) যখন তাঁর লাঠিকে সাপে পরিণত হতে দেখেন, আল্লাহ্ তাঁকে বলেছেন, "ভয় পেয়ো না।"

—যখন তিনি জাদুকরদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন, আল্লাহ্ বলেছেন, "ভয় পেয়ো না।"

—যখন সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তখন আল্লাহ্ বলেছেন, "ভয় পেয়ো না।"

কখনো কখনো আল্লাহ্ কোন জাতিকে তাদের উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে থাকতেই ধ্বংস করে দেন

কখনো কখনো আল্লাহ্ কোনো জাতিকে তাদের উন্নতি ও অকৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ শিখরে থাকা অবস্থায়ই ধ্বংস করে দেন, যার ফলে তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।

"আর কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলো।" (সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫৮)

ইসলামের উদাহরণ এক বিশাল পর্বতের মতো।

ইসলাম এক বিশাল পর্বত। এটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার ভয়ে আমরা এর প্রতিরক্ষা করি না। বরং মানুষের জন্য এতে আরোহণের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রতিরক্ষা করি।

সবচেয়ে বড় নি'আমত হলো আল্লাহকে চিনতে পারা।

কেউ যদি গুনাহ করার পর অন্তরে ব্যথা অনুভব না করে, তাহলে বুঝতে হবে আল্লাহ্ তাকে শ্রেষ্ঠতম নি'আমাত থেকে বঞ্চিত করেছেন। আর তা হলো আল্লাহর পরিচয় জানতে পারা। যেই সত্ত্বাকে অমান্য করে গুনাহ করছেন, তাঁর ক্ষমতার ব্যাপারে অজ্ঞতার অনুপাতে আপনার গুনাহও গুরুতর হবে।

শামের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়ে নিয়েছেন।

সিরিয়ায় ফিতনার যুগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এই অঞ্চলের নাম কুরআন-সুন্নাহতে কেবল বরকত আর ঈমানের সাথেই এসেছে। একটি হাসান হাদীসে আছে, "আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে সিরিয়ার (শাম) দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন।" (আবু দাউদ: ৩৪৮৫)

যারা আল্লাহর আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আল্লাহও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন

আল্লাহ্ যখন সত্যকে বিজয়ী করতে ডাকেন আর মানুষ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তখনই সে জাতির ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে আর অবশেষে পতন ঘটে। কারণ আল্লাহও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। যেমন কর্ম, তেমন ফল।

"তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করবেন আর তোমাদের পা দৃঢ় করবেন।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৭)

বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহকে মিডিয়ার খবরের সাপেক্ষে বুঝতে চাওয়াটাই অজ্ঞতা।

আল্লাহ্ তার গযব আর রহমতের মাধ্যমে মানুষকে নিদর্শন দেখিয়েই যাচ্ছেন। আজকের যুগের ঘটনাপ্রবাহগুলোকে যারা আল্লাহর গযব ও রহমতের সাপেক্ষে না বুঝে কেবল মিডিয়ার খবরের সাপেক্ষে বুঝতে চায়, তারা আসলে অজ্ঞ।

জ্ঞানী লোকের সগিরা গুনাহ অজ্ঞ লোকের কবিরা গুনাহের চেয়ে গুরুতর।

মানুষ আল্লাহর পরিচয়ের ব্যাপারে যত জ্ঞান লাভ করে, তার জন্য পাপ করা ততই গুরুতর হয়ে পড়ে। কারণ আল্লাহ এমনি এমনি পাপ করার জন্য শাস্তি দেন না, বরং মানুষ যখন জেনেশুনে পাপ করে তখন শাস্তি দেন। জ্ঞানধারীর সগিরা গুনাহ তাই অজ্ঞ লোকের কবিরা গুনাহের চেয়ে গুরুতর।

বিপদে পড়া ঈমানের লক্ষণ।

বিপদে পড়া ঈমানের লক্ষণ। যার বিপদ আসে না, তার উচিত নিজের ঈমানকে যাচাই করা।

"মানুষ কি মনে করে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?" (সূরাহ আল-'আনকাবুত ২৯:২)

আল্লাহর বড়ত্ব যে অনুভব করে তার পক্ষে আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

আল্লাহ সমগ্র বিশ্বজগতকে সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই সুচারুরূপে পরিচালনা করছেন এই বিশ্বাস যে পোষণ করে, সে কী করে মানবজীবন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে অস্বীকার করতে পারে?

"অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানবসৃষ্টির চেয়ে বড় ব্যাপার।" (সূরাহ গাফির ৪০:৫৭)

আল্লাহ চান মাজলুমরা যেন বিজয় অর্জনের পন্থাগুলো অবলম্বন করে, তাহলেই তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

আল্লাহ অবশ্যই ইসলামের বিজয়কে তরান্বিত করতে সক্ষম। কিন্তু তিনি তা প্রলম্বিত করেন অত্যন্ত প্রজ্ঞাসম্পন্ন কারণে।

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের ওপর যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চই আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দিতে সক্ষম।" (সূরাহ আল-হাজ্জ ২২:৩৯)

আল্লাহ চান মাজলুমরা যেন বিজয় অর্জনের পন্থাগুলো অবলম্বন করে, তাহলেই তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ জিহাদকে পরিত্যাগ করা

জিহাদ উম্মাহর আকীদা রক্ষা করে। ফলে উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ থাকে। যদি এটি পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে উম্মাহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে যুদ্ধে অংশও নেয় না, কোনো যোদ্ধাকে তৈরিও করে দেয় না, যোদ্ধার পরিবারের দেখাশোনাও করে না, সে কিয়ামাতের আগেই প্রচণ্ড বিপদের সম্মুখীন হবে।

নাস্তিকদের হাস্যকর বিশ্বাস।

নাস্তিকেরা বিশ্বাস করে একটা দেশ কখনো নেতা ছাড়া চলতে পারে না। অথচ নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত হওয়া মহাবিশ্বকে তারা ঠিকই পরিচালকহীন বলে বিশ্বাস করে।

"অবশ্যই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি মানবসৃষ্টির চেয়ে বড় ব্যাপার।" (সূরাহ্ গাফির ৪০:৫৭)

মানুষের জন্মমৃত্যু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন।

আল্লাহ্ মানুষকে প্রজন্মে প্রজন্মে বিভক্ত করেছেন। তারা জন্ম নেয়, মারা যায়। আল্লাহ্ যে জীবন দিতে সক্ষম, তা তারা দেখতে পায়। তারপরও তা অস্বীকার করে। যদি সমগ্র মানবজাতি একইসাথে জন্মে একইসাথে মারা যেতো, তাহলে কী অবস্থা হতো? তখন আরো বেশি করে অস্বীকার করতো।

লুকায়িত কুপ্রভাবগুলো বেশি মারাত্মক হতে পারে।

আল্লাহ্ যখন অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ করলেন, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরাহ্ আন-নূর ২৪:১৯)

কারণ মন্দ কাজের সব কুপ্রভাব সবাই বুঝতে পারে না। লুকায়িত কুপ্রভাবগুলো বরং বেশি মারাত্মক হতে পারে। আর তা বান্দার চেয়ে আল্লাহ্ আরো ভালো জানেন।

স্থান, পরিবেশ আমাদের সন্তানদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

পুণ্যভূমিতে বাস করলে সন্তানদের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

"(ইবরাহীম বললেন), হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যেন সালাত কায়েম করে।" (সূরাহ্ ইবরাহীম ১৪:৩৭)

পিতামহ কাফিরদের দেশে বাসস্থান গড়লে নাতি-নাতনীরাও কুফরে আপতিত হতে পারে।

মুজাহিদের সম্মান পিতার সম্মানের মতোই।

মুজাহিদের সম্মান পিতার সম্মানের মতোই, যেভাবে রাসূল ﷺ মুজাহিদের স্ত্রীর সম্মানকে মায়ের সম্মানের সাথে তুলনা করেছেন।

নবীজী ﷺ বলেন, "জিহাদে না যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান হলো তাদের মায়েদের সম্মানের মতো।"
(সহিহ মুসলিম: ৫০১৭, আবু দাউদ: ২৪৯৮)

উত্তম পরিণাম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত নয়।

আল্লাহ্ ধৈর্য ও দৃঢ়তার আদেশ দিয়েছেন। ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অনুকরণীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এখানে মূল উদ্দেশ্য না। উদ্দেশ্য হলো ধৈর্য ও দৃঢ়তা যে ইসলামের চিহ্ন, তা বোঝানো।

"আর উত্তম পরিণাম মুত্তাক্বীদের জন্যই নির্দিষ্ট।**"** (সূরাহ্ তা-হা ২০:১৩২)

উত্তম পরিণাম কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত নয়।

আল্লাহ্ যদি বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে মানুষ জুলুমবাজ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে সংশোধনের জন্য বিপদ দেন। কারণ তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখলে তারা যুলুমবাজ হয়ে যেতো।

"আমি তাদের প্রতি দয়া করলেও আর তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করলেও তারা তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খেতে থাকবে।" (সূরাহ আল-মু'মিনুন ২৩:৭৫)

আল্লাহকে চিনতে পারে না বলেই মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না।

আল্লাহকে চিনতে পারে না বলেই তারা উপদেশ গ্রহণ করে না। যাকে চেনেই না, তাঁকে ভয় করবেই বা কী করে?

"এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে, যে ভয় করে।"
(সূরাহ্ আন-নাযি'আত ৭৯:২৬)

ইসলামী সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ নববী আদর্শ থেকে বিচ্যুতি।

একটি ইসলামী রাষ্ট্র যতদিন নববী আদর্শের ওপর থাকে, ততদিন আল্লাহ্ একে স্থিতিশীল রাখেন। নববী পথ থেকে বিচ্যুত হলে তবেই এর পতন ঘটে। ইতিহাসে যত ইসলামী সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, সব নবীর পথ থেকে বিচ্যুতির ফলেই হয়েছে।

আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হলে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে।

ফিতনার উদ্ভব হলে বুঝতে হবে আল্লাহর কোনো আদেশ অমান্য করা হচ্ছে অথবা তাঁর কোনো নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

"কাজেই যারা তাঁর (রাসূলুল্লাহর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের ওপর ফিতনা নেমে আসবে কিংবা তাদের ওপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি।" (সূরাহ আন-নূর ২৪:৬৩)

আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেলেও সাওয়াব পাবে।

আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ যদি বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায়ও মারা যায়, তাও সে সাওয়াব পাবে।

“যদি তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ করো, তবে আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অতি উত্তম তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে।” (সূরাহ আলি ‘ইমরান ৩:১৫৭)

নিজের ক্ষুদ্র জ্ঞানে অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করাটা বড় বোকামি।

প্রবীণের উপদেশ শুনে নবীন ঠাট্টা করে। অথচ নিজে বুড়ো হওয়ার পর সেই উপদেশের যথার্থতা উপলব্ধি করে আফসোস করে। বয়স আর অভিজ্ঞতাই যেখানে এমন পার্থক্য গড়ে দেয়, সেখানে অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর আদেশ অমান্য করাটা কতই না বোকামি!

মাজলুমের জন্য আল্লাহর বিশেষ নি’আমত হলো তাদের চোখের সামনে জালিমকে ধ্বংস করা।

মাজলুমের প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ নি’য়ামাত হলো তাদের চোখের সামনেই জালিমকে ধ্বংস করা।

“স্মরণ করো যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম আর তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফির’আউনের গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:৫০)

আল্লাহ বান্দাকে সংকটময় পরিস্থিতিতে ফেলেন যাতে সে আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগ পায়।

প্রাচুর্যের ফলে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, সীমালঙ্ঘন করে। তাই আল্লাহ তাকে সংকটময় পরিস্থিতিতে ফেলেন যাতে সে আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগ পায়।

“তোমার পূর্বে আমি বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি আর (সেসব জাতির অবাধ্যতার কারণে) তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা বিনীত হয়।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৪২)

কুফরের পর সবচেয়ে বড় পাপ হলো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা।

কুফরের পর সবচেয়ে বড় পাপ হলো অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। আর কোনও গুনাহ যদি ব্যক্তিকে কুফরের দিকে টেনে নিতে সমর্থ হয়, তা হলো অন্যায় হত্যাকাণ্ড। হাদীসে আছে, “মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত তার দ্বীনের হেফাজত করতে থাকে যতক্ষণ না সে অন্যায় রক্তপাত ঘটায়।” (বুখারি: ৬৪৬৯)

বেশিরভাগ সময় আযাব আসে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের সময়।

বেশিরভাগ সময়ই কোনো জাতির ওপর আল্লাহর আযাব আসে তাদের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের সময়ে। দারিদ্র্য ও সংকটের সময়ে নয়। কারণ সচ্ছলতা আর প্রাচুর্যের সময়েই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়, পাপাচারে বেশি লিপ্ত হয়।

আল্লাহর শাস্তি থেকে পালানো অসম্ভব।

আল্লাহর শাস্তি থেকে পালানো অসম্ভব। মূসার (আলাইহিসসালাম) জন্মের ভয়ে ফির'আউন মিশরের নবজাতকদের হত্যা করেছিলো। অথচ তার ঘরে এবং তার খরচেই আল্লাহ মূসাকে প্রতিপালন করিয়েছেন।

নি'আমত পেয়ে আল্লাহর থেকে দূরে সরে যাওয়া হলো আযাব।

আল্লাহ বান্দাকে নি'আমত দান করেন, এটা রহমতস্বরূপ। কিন্তু বান্দা যদি সেই নি'আমতের ফিতনায় পড়ে যায় আর আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তখন সেটা আযাব।

"তারা কি ভেবে নিয়েছে, আমি যে তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদির প্রাচুর্য দিয়ে সাহায্য করেছি, এর দ্বারা কি তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।"
(সূরাহ আল-মুমিনুন ২৩:৫৫-৫৬)

কষ্টের পর স্বস্তি আসবেই।

কষ্টের পর স্বস্তি আসবেই। আল্লাহই নির্ধারণ করেন কোনটার ব্যাপ্তিকাল কত দীর্ঘ হবে। কিন্তু স্বস্তির ব্যাপ্তি তার সংশ্লিষ্ট কষ্টের চেয়ে দীর্ঘই হয়ে থাকে।

"আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।" (সূরাহ আত-ত্বালাক্ব ৬৫:৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "একটি কষ্ট কখনোই দুটি স্বস্তিকে ধরতে পারবে না।"
(মুস্তাদরাক হাকিম: ৩৯৫০)

দুনিয়াবি সম্পদ নিজে কোনো উপকার করতে পারে না।

দুনিয়াবি সম্পদ নিজে কোনো উপকার করতে পারেনা। এগুলো আল্লাহর হুকুমের অধীন। যেই পানিকে আল্লাহ শিশু মূসার (আলাইহিসসালাম) জন্য নিরাপদ আশ্রয় বানালেন, সেই পানিতেই তিনি ফির'আউনকে ডুবিয়ে মারলেন।

"অতঃপর দরিয়া তাকে (মূসাকে) পাড়ে ঠেলে দিবে।" (সূরাহ ত্বা-হা ২০:৩৯)

"আর তাদেরকে (ফির'আউন ও তার লোক লস্করকে) সাগরে ডুবিয়ে মারলাম।"
(সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:১৩৬)

আল্লাহর আইন মান্য করা হলে ক্ষমতা ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবে।

তারা ভাবে আল্লাহর আইন কায়েম করলে তাদের দেশ দুর্বল হয়ে যাবে আর অর্থনীতি ধসে পড়বে। হুদ (আলাইহিসসালাম) তাঁর জাতিকে ওয়াদা করেছিলেন যে, একাজ করলে বরং ক্ষমতা ও প্রাচুর্য বৃদ্ধি পাবে।

"তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের শক্তিকে আরো শক্তি দিয়ে বাড়িয়ে দিবেন।" (সূরাহ হুদ ১১:৫২)

আল্লাহর শত্রুদের ওপর আযাব আসাটা নিশ্চিত; শুধু আযাব আসার সময় আর ধরনটা পাল্টায়।

আল্লাহর শত্রুদের ওপর তাঁর আযাব নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত। এতে কোন পরিবর্তন হয় না। যা পরিবর্তিত হয় তা হলো আযাব আগমনের সময় ও এর ধরন।

"যারা অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো আল্লাহর বিধান, তুমি আল্লাহর বিধানে কক্ষনো হেরফের পাবেনা।" (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:৬২)

শামে ফিতনার অবসান হলেই ইসলামের বিজয় আসবে।

শামে ফিতনার অবসান হলে এর পরপরই আসবে ইসলামের বিজয়, ঈমানের প্রতিষ্ঠা আর নিফাকের উচ্ছেদ। রাসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় ফিতান সংঘটিত হওয়ার সময়ে (ক্বিয়ামাত নিকটবর্তী হলে) ঈমান থাকবে শামে।" (হাকিম: ৮৫৫৪)

নি'আমতের না-শোকরি করলে সে জাতির ওপর ভয়, দারিদ্র্য ও অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

নি'আমতের না-শোকরি করলে সে জাতির ওপর ভয়, দারিদ্র্য ও অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া হয়।

"অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নি'আমতরাজির প্রতি কুফরি করলো। অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুসিবত তাদেরকে আস্বাদন করালেন।" (সূরাহ আন-নাহল ১৬:১১২)

দুনিয়ার চাকচিক্য বান্দার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

আল্লাহ এই দুনিয়াকে ছলনাময় ও আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করে পরীক্ষা করেন কে কত দৃঢ়প্রত্যয়ী, কে নিজের নফসের ওপর রব্বের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়।

"জমিনের ওপর যা কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার শোভা-সৌন্দর্য করেছি যাতে আমি মানুষকে পরীক্ষা করতে পারি যে, আমালের ক্ষেত্রে কারা উত্তম।"
(সূরাহ আল-কাহ্ফ ১৮:৭)

ইসলাম দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যই।

ইসলাম এসেছে মানুষের দ্বীনি ও দুনিয়াবি উভয় জীবনকে সংশোধন করতে। একে শুধু দ্বীনি ক্ষেত্রে বা শুধু দুনিয়াবি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা-উভয়ই ইসলামের বিকৃতি।

নবীজীকে ﷺ ব্যঙ্গকারীর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই ধ্বংস হবে।

নবীজীকে ﷺ ব্যঙ্গকারী যদি তাওবাহ না করে, তাহলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে এর ফল ভোগ করবে।

“আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি দিবেন।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৭৪)

আল্লাহ বিপদে ফেলে বান্দাকে শিক্ষা দেন।

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফেলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, আল্লাহ্ যদি তাকে বিপদে ফেলতে চান তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষও তাকে উদ্ধার করতে পারবে না।

“আল্লাহ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া আর কেউ তা সরাতে পারবে না।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:১৭)

ইসলাম হচ্ছে জীবন আর অবিশ্বাস হলো মরণ।

ইসলাম হচ্ছে জীবন আর অবিশ্বাস হলো মরণ। যখনই উম্মাহর ঈমান হ্রাস পায়, তখনই তার অসুস্থতা আর পশ্চাৎপদতা বৃদ্ধি পায়। ঈমান হ্রাস পেতে পেতে একসময় সেই অসুস্থতা মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছায়।

“ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে ডাকা হয় (এমন বিষয়ের দিকে) যা তোমাদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে।’’ (সূরাহ আল-আনফাল ৮:২৪)

ইসলাম সকল মতাদর্শের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে।

কিয়ামত ততদিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না যতদিন না ইসলাম দুনিয়ার সকল মতাদর্শের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

“তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।” (সূরা আস সফ ৬১:৯)

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীর জন্য মর্যাদাস্বরূপ সৃষ্টি করেননি। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য মর্যাদাস্বরূপ।

আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীর জন্য মর্যাদাস্বরুপ সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য মর্যাদাস্বরুপ। তিনি জমিনকে মানুষের অনুগত করে রেখেছেন যাতে করে মানুষেরা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয়।

"পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২৯)

আল্লাহ্‌র শত্রুকে যে সমর্থন করে আল্লাহ্ তাকে পরিত্যাগ করবেন।

আল্লাহ্‌র শত্রুকে যে সমর্থন করে, তাকে আল্লাহ্ পরাজিত ও পরিত্যাগ করার শপথ করেছেন, যদিও তা কিছুকাল পরেও হয়।

"তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না, তাহলে আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে। আর তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তোমাদের অভিভাবক থাকবে না, অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।" (সূরাহ হুদ ১১:১১৩)

আল্লাহ্ মাজলুমের দু'আ কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখে জালিমকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দেন।

মাজলুম কাফির হলেও তার দু'আ বৃথা যায় না। কিন্তু আল্লাহ্ হয়তো তা স্থগিত রেখে জালিমকে সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। মাজলুমের দু'আ যদি দ্রুত কবুল করা হতো, তাহলে মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যেতো।

আখিরাতে ফয়সালা হবে ঈমানের ভিত্তিতে।

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কাফির হলেও দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাকে উঁচু মর্যাদা দেন। আর অন্যায়কারী মু'মিন হলেও তাকে অপদস্থ করেন। কিন্তু পরকালে আল্লাহ্ মুওয়াহহিদ (তাওহিদে বিশ্বাসী মুমিন)-কেই কাফিরের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিবেন। কারণ কাফির অন্যের অধিকার দিতে গিয়ে নিজের অধিকারকেই (জান্নাত) ভুলে বসেছে।

আল্লাহ্ ভালো এবং মন্দকে অস্তিত্ব দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্য, মানুষের খেয়াল-খুশিমতো বাছাইয়ের জন্য নয়।

আল্লাহ্ যেমন বিষাক্ত খাবার সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে ভ্রান্ত মতাদর্শও সৃষ্টি করেছেন। ভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে বিষ খাওয়ার মতোই। আল্লাহ্ ভালো এবং মন্দকে অস্তিত্ব দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করবার জন্য, মানুষের খেয়াল-খুশিমতো বাছাইয়ের জন্য নয়।

আল্লাহ্র রাসূলের ইজ্জতের হেফাজত মানে নিজের ঈমানের হেফাজত।

আমরা আল্লাহ্র রাসূলের ﷺ ইজ্জতের হেফাজত করবো এই কারণে না যে আমরা হেফাজত না করলে রাসূলের ﷺ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে। বরং আমরা রাসূলের ﷺ ইজ্জতের হেফাজত করবো আমাদের নিজেদের জন্যই। কারণ এটাই নিশ্চিত করবে রাসূলের ﷺ ওপর আমাদের ঈমান আছে কি নেই!

আল্লাহ তাঁর রাসূলকেও ﷺ নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করার অনুমতি দেননি।

এমনকি নবীজীকেও ﷺ তাঁর নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী বিচার-**ফয়সালা** করার অধিকার আল্লাহ্ দেননি। তাহলে অন্য কোনো শাসক বা আলেম কী করে নিজেদের মতামত আর খেয়ালখুশি মাফিক বিচার করতে পারে?

“আল্লাহ্ যা তোমাকে জানিয়েছেন, যেন তুমি সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করো...।” (সূরাহ্ আন-নিসা ৪:১০৫)

আল্লাহ্ দুটি কারণে মানুষের দোষ প্রকাশ করে দেন।

আল্লাহ্ দুটি কারণে মানুষের দোষ প্রকাশ করে দেন।

- যদি সে অন্যের দোষ প্রচার করে বেড়ায়।
- যদি সে গোপনে অতিরিক্ত গুনাহ্ করে, তাহলে তার কিছু অংশ প্রকাশ করে আল্লাহ্ তাকে ও অন্যদের নিরস্ত করেন।

জালিমের পতনের ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়।

যালিমের ওপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রতিশোধ নিবেন। কিন্তু সেই নির্ধারিত সময় মাযলুমেরা নির্ধারণ করে দিতে পারেনা। দিনক্ষণ, স্থান, পদ্ধতি সবকিছুর ফয়সালা আসমানে হয়, জমিনে নয়।

আযাব আসার আগে আল্লাহ্ ঠিকই নিদর্শন দিয়ে সতর্ক করেন, কিন্তু মানুষ তা অবহেলা করে।

কোনো জাতির ওপর আল্লাহ্র আযাব এসে পড়ার পরও তারা এর কারণ বুঝতে পারে না। আসলে তাদেরকে আল্লাহ্ ঠিকই তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা সেসবকে অবহেলা করেছে।

“আসমানে আর জমিনে বহু নিদর্শন আছে যেগুলোর ওপর দিয়ে তারা (প্রতিনিয়ত) অতিক্রম করে কিন্তু এসব কিছুকে তারা অবজ্ঞা করছে।”

(সূরাহ্ ইউসুফ ১২:১০৫)

আল্লাহ্ই বিপদ দেন, আবার তিনিই বিপদ থেকে মুক্ত করেন।

আল্লাহ্ই বিপদ দেন, আবার তিনিই বিপদ থেকে মুক্ত করেন। মাখলুক অনিচ্ছুক হলেও সে আল্লাহর এই ফয়সালায় মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তিমির ইচ্ছা ছিলো খাদ্য হিসেবে ইউনুসকে (আলাইহিস্সালাম) হজম করা। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সে তাঁকে বের করে দেয়।

কুরআন হলো অন্তরের জন্য আলো।

কুরআন হলো অন্তরের জন্য আলো। কারণ একে যিনি নাযিল করেছেন, তিনিই অন্তরের স্রষ্টা। আর তিনিই ভালো জানেন সেই অন্তরের জন্য কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ।

"আর আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"
(সূরাহ আন-নিসা ৪:১৭৪)

"তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট জ্যোতি ও কিতাব এসেছে।"
(সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:১৫)

"...আর তার ওপর অবতীর্ণ সেই আলোর অনুসরণ করে...।"
(সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:১৫৭)

সাহাবাদের মর্যাদা।

উম্মাহর বাঁচার অবলম্বন হলো ওয়াহী। এটি ছাড়া আর কোনো কিছু দিয়েই উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। সকল ভ্রান্ত ফিরকাই কুরআন-হাদীসের কথাগুলোকে অপব্যাখ্যা করে সেই ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়। কিন্তু রাফিদ্বা (শি'য়া) গোষ্ঠীর কর্মপদ্ধতি আলাদা। তারা একটা শর্টকাট পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। যেই সাহাবাগণের মাধ্যমে ওয়াহীর জ্ঞান আমাদের কাছে এসেছে, তাঁদের মর্যাদাকেই তারা অস্বীকার করে। ফলে সম্পূর্ণ ওয়াহীকে অস্বীকার করার একটা অজুহাত দাঁড়িয়ে গেছে।

ইবনে 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, "সাহাবাদেরকে গালি দিও না। (নবীজীর ﷺ সাথে অতিবাহিত) তাঁদের জীবনের এক ঘণ্টা তোমাদের আজীবনের নেক আমলের চেয়ে উত্তম।"

এই হলো সাহাবাদের সাথে তাঁদের ঠিক পরের প্রজন্মের (তাবি'উন) পার্থক্য। তাহলে আমাদের সাথে কেমন পার্থক্য হবে?

আর আলেমগণের ইজমা হলো যে সাহাবাগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) কাউকে অভিশাপ দেয়, সে কাফির। আগে মুসলিম থাকলে সে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাওবাহ করতে বলার পর তাওবাহ না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

যে আল্লাহ্‌র অধিকার নিয়ে সচেতন নয় সে বান্দার অধিকার নিয়েও সচেতন থাকবে না।

যে ব্যক্তি তার প্রতি আল্লাহর অধিকারগুলো স্বীকার করেনা, সে তার প্রতি মানুষের অধিকারও স্বীকার করবেনা। কারণ হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) হলো মানদণ্ড। এর ভিত্তিতেই হাক্কুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) নির্ধারিত হয়।

মু'মিন আল্লাহ্‌র ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ না করে আল্লাহ্‌র সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা দেখে অভিভূত হয়।

মু'মিন যখন যালিমের যুলুম বাড়তে দেখে, তখন সে যালিমের ওপর আল্লাহর ক্ষমতাকে সন্দেহ করেনা। বরং এত বড় যালিমের সাথে আল্লাহর সহনশীলতা ও প্রজ্ঞা দেখে অভিভূত হয়। নবীজী ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই জালিমকে আল্লাহ সাময়িক অবকাশ দেন..."

আল্লাহকে অসম্মান করার একটি উদাহরণ হলো দ্বীনি কাজে দ্বীনের চরম অবাধ্য লোককে নিয়োগ করা।

আল্লাহকে অসম্মান করার একটি উদাহরণ হলো দ্বীনি কাজে দ্বীনের চরম অবাধ্য লোককে নিয়োগ করা।

"এই (তার অবস্থা), আর যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করবে সে তো তার অন্তরস্থিত আল্লাহ-ভীতি থেকেই তা করবে।"

(সূরাহ আল-হাজ্জ ২২:৩২)

বায়তুল্লাহর চেয়ে মুসলিমের জান ও ইজ্জতের মূল্য আল্লাহর নিকট বেশি।

বায়তুল্লাহর চেয়ে মুসলিমের জান ও ইজ্জতের মূল্য আল্লাহর নিকট বেশি। নবীজী ﷺ কাবার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "তুমি কতই না পবিত্র। অথচ মু'মিন আল্লাহর কাছে তোমার চেয়েও বেশি পবিত্র।" (ইবনু মাজাহ: ৩৯৩০)

নবীগণের পিতামাতার চেয়ে অন্য কোনো মুশরিক বেশি সম্মানিত হতে পারে না।

আল্লাহ ইবরাহীমকে (আলাইহিসসালাম) তাঁর মুশরিক পিতার জন্য দু'আ করতে দেননি। মুহাম্মাদকেও ﷺ তাঁর মায়ের জন্য দু'আ করতে দেননি। হাদীসে আছে, "আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি তা দেননি।" (মুসলিম: ৯৭৬)

নবীগণের পিতামাতার চেয়ে অন্য কোনো মুশরিক বেশি সম্মানিত হতে পারে না।

আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবার মিথ্যা আশা।

যদি বলা হতো আল্লাহর আযাব এসে একজন ছাড়া সবাইকে ধ্বংস করে দিবে, তা হলে সকলেই ওই একজন হওয়ার আশায় গুনাহ করা চালিয়ে যেতো। আর এই আশায় থাকে বলেই আল্লাহর আযাব নাযিল হতে দেখেও অনেক মানুষই এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

“কাজেই তাদের ব্যাপারে তাড়াহুড়া কোরো না। আমি গুণে রাখছি তাদের জন্য নির্দিষ্ট (দিবসের) সংখ্যা।” (সূরাহ মারইয়াম ১৯:৮৪)

মানবজাতির সাথে আল্লাহ্‌র চিরাচরিত আচরণ।

দুর্বলেরাও যদি ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে, তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর শক্তিশালীরা অন্যায়কারী ও অবিচারক হলে তারা অপদস্থ হয়ে যায়। মানবজাতির সাথে এটিই আল্লাহর চিরাচরিত আচরণ।

“দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিলো, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছা করলাম আর তাদেরকে নেতা ও উত্তরাধিকারী করার ইচ্ছা করলাম।” (সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫)

পিতা এবং সন্তান একে অপরের জন্য রহমতস্বরূপ।

পিতাকে তার সন্তানদের কারণে রিযিক দেওয়া হয়, আবার সন্তানদেরকে তাদের পিতার কারণে রিযিক দেওয়া হয়। তারা যেন পরস্পরের জন্য রহমত।

“আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।”
(সূরাহ আল-আন’আম ৬:১৫১)
“আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি।”
(সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৩১)

দুঃখ কষ্টের পর-নি’আমত পাওয়াটা ফিতনা।

দুঃখ-কষ্টের পর নি’আমত পাওয়াটা ফিতনা (পরীক্ষা)। আল্লাহ পরীক্ষা করেন যে বান্দা সেই নি’আমতের জন্য কৃতজ্ঞ হয় কি না। যদি সে কৃতজ্ঞ হয় তবে আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো, আর যদি নি’আমত পেয়ে নাফরমানি শুরু করে তবে সে ফিতনায় ডুবে গেলো।

“আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, সে আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন আমার পক্ষ থেকে তার ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করি, সে বলে, ‘এটা তো আমি আমার জ্ঞানবলে পেয়েছি।’বরং এটি ফিতনা।” (সূরাহ আয-যুমার ৩৯:৪৯)

যে সুধারণা রাখে, সে নেক আমল করে। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে যে নিরাপদ বোধ করে সে বদ আমল করে।

আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা রাখা আর আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ বোধ করা দুটি আলাদা জিনিস। এদের পার্থক্য বোঝা যায় আমলের মাধ্যমে। আল্লাহর ব্যাপারে যে সুধারণা রাখে, সে নেক আমল করে। আর আল্লাহর শাস্তি থেকে যে নিরাপদ বোধ করে সে বদ আমল করে।

ক্রিসমাসের শুভেচ্ছা জানানোর বিধান।

'মেরি ক্রিসমাস' বলে অমুসলিমদের শুভেচ্ছা জানানো যে হারাম এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার ইমামের ইজমা আছে। এই জামানায় এসেই শুনছি এ ব্যাপারে নাকি 'ইখতিলাফ'আছে। তবে সেই 'ইখতিলাফ' এতটাই নগণ্য যে সেটা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য না।

আহলে কিতাবধারী হিসেবে কোন খ্রিস্টান কিংবা ইহুদীকে বিয়ে করা জায়েয। কিন্তু এর অর্থ এই না যে, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানানোটাও আপনার জন্য জায়েয হয়ে গেলো। আপনার পিতার হত্যাকারীর মেয়েকে আপনি চাইলে বিয়ে করতে পারেন, এটা নাজায়েয নয়। কিন্তু আপনার পিতার মৃত্যুবার্ষিকী নিশ্চয় আপনি তার সাথে উদযাপন করতে যাবেন না। তাহলে আপনার আহলে কিতাব স্ত্রীর সাথে আল্লাহর সন্তানের (!) জন্মদিন পালন করেন কী করে!

আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, এরকম কুৎসিত মিথ্যাচারকারী কোন খ্রিস্টানকে শুভেচ্ছা জানানো আপনার জন্য জায়েয নয়, যদিও সে আপনাকে ঈদের দিন শুভেচ্ছা জানায়। কারণ আল্লাহর আইন অদলবদল করার কোন সুযোগ নেই। এক মূর্তিপূজারী আপনার সাথে মসজিদে এসেছে এজন্য আপনাকেও তার মূর্তির গুণকীর্তন করতে হবে, এই রীতি আল্লাহর দ্বীনে নেই।

অমুসলিমের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়, এটা শরীয়তের এমন এক সিদ্ধান্ত যে বিষয়ে আমাদের প্রসিদ্ধ চার ইমামদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য হয়নি। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) এই ইজমার কথা উনার 'আহকামু আহলিয যিম্মাহ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য সালাফরাও এই বিষয়ে সর্বসম্মত ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন। এই বিষয়ে কেউ মতভেদ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

সত্য মিথ্যার চিরন্তন দ্বন্দ্ব

সৃষ্টির সেই সূচনালগ্ন থেকেই সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে। ইবলিস আর আদামের সময় থেকে চলে আসা সেই দ্বন্দ্বে দুটি অনুসারী দল সবসময় থাকবে। আল্লাহর দ্বীনকে যারা ধ্বংস করে দিতে চায় তারা তাদের নতুন নতুন কর্মপদ্ধতি নিয়ে হাজির হয়। সকল নবী রাসূলগণই সত্য মিথ্যার এই দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন। তাদেরকে অপমান করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে, এমনকি তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে। কিন্তু মিথ্যার অনুসারীদের সেই ষড়যন্ত্র আর প্রাণপণ লড়াই সত্ত্বেও সত্য এবং এর অনুসারীরা বিজয়ী হবে। এই অধ্যায়ে শাইখ সত্য মিথ্যার সেই চিরন্তন দ্বন্দ্বগুলোকে তুলে এনেছেন তুলির নিপুণ আচড়ে। নবী রাসূলদের বিরুদ্ধে মিথ্যার অনুসারীদের আচরণ আর সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়া, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সেই শিক্ষাকে কাজে লাগানো এই আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ।

মিথ্যা আর এর অনুসারীরা হারিয়ে যাবে, টিকে যাবে সত্য আর সত্যের পক্ষে সিনা টান করে দাঁড়ানো মানুষগুলো।

তারা নবীজীর ﷺ দা'ওয়াহকে পশ্চাৎপদ বলে আখ্যায়িত করতো। বলতো—

"এগুলো তো আদিকালের উপকথা মাত্র।" (সূরাহ আল-মুমিনুন ২৩:৮৩)

আরো বলতো যে নবীজীর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর দা'ওয়াহও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ তাঁর কোনো বংশধর নেই। আজ তাদের নিজেদের ধর্মই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর মুহাম্মাদের ﷺ নাম ও ধর্ম টিকে রয়েছে।

হকপন্থীরা পরাজিত হয় না, আল্লাহ্‌র কাছে পরীক্ষিত হয়।

হকপন্থী কখনো পরাজিত হয় না। তাকে কেবল কষ্টকর পরিস্থিতিতে ফেলে পরীক্ষা করা হয়, যাতে সে বিজয়ের সত্যিকার হকদারে পরিণত হয়। আর আসমানী সাহায্য আসে দুনিয়াবি কষ্ট-ক্লেশের সমানুপাতে।

"তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যে মনে করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যে মনে করা এবং কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে। আল্লাহর ওয়াদার পরিবর্তন হয় না, নবীগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট পৌঁছেছেই।" (সূরাহ আল-আন'আম ৬:৩৪)

রাসূল ﷺ দেশছাড়া হয়েছেন, মার খেয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন। ইউসুফ (আলাইহিসসালাম) কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছেন, মিথ্যা অভিযোগে কারাবাস করেছেন। এগুলো পরাজয় নয়, বরং পরীক্ষা। প্রতিটি পরীক্ষাই বিজয়ের দুয়ারের দিকে এগোনোর একেকটি সিঁড়ি।

তাই সত্যের পথে চলতে গিয়ে দুঃখকষ্টে থেমে যাওয়া চলবে না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে যোগ্য প্রমাণ করতে হবে যাতে আসমান থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের প্রতিশ্রুত বিজয় নেমে আসে।

আবু লাহাব আর তার মিডিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে আর মুহাম্মাদের ﷺ আনীত বার্তা আজও টিকে আছে।

মুশরিকরা তাদের মিডিয়াকে নবীজীর ﷺ বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলো। আবু লাহাব ওকায বাজারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতো, "নিশ্চয় মুহাম্মাদ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই সে যেন তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে না পারে।"

আবু লাহাব আর তার মিডিয়া ধ্বংস হয়ে গেছে আর মুহাম্মাদের ﷺ আনীত বার্তা আজও টিকে আছে।

জালিমের জুলুম একসময় শেষ হবেই।

জুলুমের সিঁড়ি বেয়ে যালিম উপরে উঠে। তার উত্থান দেখে হতাশ হতে নেই।

কারণ, সিঁড়ির ধাপ একসময় শেষ হবেই, সে পর্যায়ে গিয়ে এমনিতেই সে আর পা রাখার জায়গা পাবে না।

"ওইসব জনদপকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম যখন তারা বাড়াবাড়ি করেছিলো, আর তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য একটা প্রতিশ্রুত সময় স্থির করেছিলাম।" (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৫৯)

নবীজীকে ব্যঙ্গ করে লেখা কবিতা ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেছে, আর নবীজীর হাদীসগুলো সংরক্ষিত আছে।

আইয়ামে জাহিলিয়্যাতের লোকেরা রাসূলকে ﷺ ব্যঙ্গ করে লেখা শত শত চরণ কবিতা আবৃতি করতো। কবিতা যদিও তৎকালীন আরবের মিডিয়া ছিলো, তবুও ইতিহাস এসব কবিতার একটা চরণও রেকর্ড করেনি। কিন্তু নবীজীর হাদীসগুলোকে ঠিকই সংরক্ষণ করেছে। মিথ্যার জন্মই হয় ধ্বংস হওয়ার জন্য। সত্য টিকে থাকে, যদিও তাঁকে প্রথমে দুর্বল মনে হয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত বিবেচনাযোগ্য, কিন্তু সত্যের উপর প্রাধান্যযোগ্য নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে সবসময় প্রাধান্য দিতে হলে লূত (আলাইহিসসালাম), মূসা (আলাইহিসসালাম) ও মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর যথাক্রমে সমকামী সাদ্দূমবাসী, ফিরআউন ও আবু জাহলকে প্রাধান্য দিতে হতো। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু তা সত্যের বিপরীতে হলে তার মূল্য শূন্য হয়ে যায়।

সাবা জাতির প্রাচুর্যের প্রতি মুগ্ধতা হুদহুদকে তাদের কুফরের ব্যাপারে অন্ধ করে দেয়নি।

সাবা জাতির প্রাচুর্যের প্রতি মুগ্ধতা হুদহুদ পাখিকে তাদের কুফরের ব্যাপারে অন্ধ করে দেয়নি। সে ফিরে এসে তাদের প্রাচুর্যের ব্যাপারে যেমন বলেছে, তেমনি তাদের জঘন্য কুফরিও উল্লেখ করেছে।

"আমি দেখলাম এক নারী তাদের উপর রাজত্ব করছে, আর তাকে সবই দেওয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। এবং আমি তাকে আর তার সম্প্রদায়কে দেখলাম আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করতে। শয়তান তাদের কাজকে তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে (আল্লাহর) পথ থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে, তাই তারা পথ খুঁজে পায় না।" (সূরাহ আন-নামল ২৭:২৩-২৪)

যেখানেই ফির'আউন থাকবে আল্লাহ সেখানে একজন মূসাকে পাঠাবেন।

জালিমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহর দারুণ এক পদ্ধতি আছে। ফির'আউনের জুলুমের শুরু থেকেই আল্লাহ মূসাকে ('আলাইহিসসালাম) একজন সতর্ককারী ও

শাস্তির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলছিলেন। একজন জুলুমের জন্য তৈরি হয়, আরেকজন মোকাবেলার জন্য। তারপর একসময় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। তাই যেখানেই ফির'আউন থাকবে আল্লাহ্ সেখানে একজন মূসাকে পাঠাবেন। আর এটাই আল্লাহর সুন্নাহ।

তাদের কান নবীর দিকে, কিন্তু মন পড়ে থাকে নবীর শত্রুদের কাছে।

উম্মাহ অবশ্যই এমন লোকের দ্বারা আক্রান্ত হবে যারা উম্মাহর মাঝে দ্বীনের শত্রুদের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ বিস্তারে সহায়তা করবে।

"আর তোমাদের মাঝে তাদের (মুনাফিক্বদের) কথা শোনার মতো লোক আছে।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৭)

মুনাফিক্বরা অন্যের কানে লাগানোর জন্য নবীর কথা শুনতো । তাদের কান নবীর দিকে, কিন্তু মন পড়ে থাকতো নবীর শত্রুদের কাছে।

আজকের যুগের জাহিলিয়াত হলো শত্রুদের অন্ধ অনুসরণ।

ধর্মের ব্যাপারে আরবের জাহিলি যুগের লোকেরা আজকের যুগের জাহিল লোকেদের চেয়ে ভালো ছিলো। কারণ আরবদের জাহিলিয়া ছিলো বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। আর আজকের জাহিলিয়া হলো শত্রুদের অন্ধ অনুসরণ।

"নিশ্চয় আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এক দ্বীনের উপর পেয়েছি, আর আমরা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।" (সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:২৩)

দুনিয়ালোভী ও আখিরাতপ্রত্যাশীর মাঝে পার্থক্য যেভাবে হয়!

কঠিনতম ফিতনাসমূহের একটি হলো মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হক্বের পক্ষে কথা বলা, সকলের মাঝে নিজের মর্যাদা উন্নত হতে দেখা, তারপর হঠাৎ একদিন নিজেকে একা অবস্থায় আবিষ্কার করা। এখানেই দুনিয়ালোভী ও আখিরাতপ্রত্যাশীর মাঝে পার্থক্য তৈরি হয়ে যায়।

সত্য ও নিজের খেয়াল-খুশির পার্থক্য।

সত্য ও নিজের খেয়াল-খুশির মাঝে যদি কেউ পার্থক্য বুঝতে চায়, সে যেন নিজেকে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে এক সেতুর উপর কল্পনা করে। পেছনে দুনিয়া যা তাকে ফিরিয়ে নিতে অক্ষম। আর সামনে আখিরাত যা তাকে বরণ করতে প্রস্তুত।

আল্লাহ সত্যকে বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন, কোন বিশেষ দলকে না।

বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে অনেক মানুষ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ সত্যকে বিজয় দানের ওয়াদা করেছেন, কোন বিশেষ দলকে না। আল্লাহ তার নবীকে এই জমিনে কর্তৃত্ব দান করেছেনএ দৃশ্য দেখার আগেই অনেক সাহাবার মৃত্যু হয়েছে। তারা কেউ বিজয়ের মুহূর্ত চোখে দেখেননি

তাতে কি, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে ঠিকই বিজয়ীর বেশে দণ্ডায়মান হবেন।

কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়েই আল্লাহ মাজলুমকে জালিমের উপর বিজয় দান করেন।

মাজলুম কোনো জাতি কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে না গিয়ে কখনো জালিমের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। বনী ইসরাঈলের সদ্যজাত শিশু ও মুমিনদেরকে হত্যা করা হয়েছিলো। এমনকি মূসা ('আলাইহিসসালাম) এর জীবদ্দশাতেই তাদেরকে হত্যা ও শূলবিদ্ধ করা হয়েছিলো। এ সবকিছুর পরেই তারা ফির'আউনের উপর বিজয় লাভ করে।

মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রশংসা পাওয়া বৃহৎ দল হওয়ার চেয়ে সত্যের উপর থেকে নিন্দা কুড়ানো ক্ষুদ্র দল হওয়াই উত্তম।

সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সকল মানুষ কখনোই একটি মতের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। আর না কোনো দল সর্বদা প্রশংসা বা নিন্দা থেকে মুক্ত থাকবে। কাজেই, মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রশংসা পাওয়া বৃহৎ দল হওয়ার চেয়ে সত্যের উপর থেকে নিন্দা কুড়ানো ক্ষুদ্র দল হওয়াই উত্তম।

কোন মত অনুসরণ করার মাপকাঠি সেটা অনুসরণ করে তৃপ্তিবোধ করা নয়।

কোনো মত প্রশংসিত হলেই বা তা অনুসরণের মাধ্যমে তৃপ্তিলাভ হলেই তা সঠিক হয়ে যায় না।

"তারা হলো সেসব লোক যাদের প্রচেষ্টা দুনিয়ায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবছিলো তারা নেক আমল করছে।" (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:১০৪)

আল্লাহ এমনও অনেক বিধান দিয়েছেন যার যৌক্তিকতা মানুষের সীমিত বুদ্ধি-বিবেচনার বিপরীত হতে পারে।

ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোতে শত্রুদের সাথে সমঝোতা কোন জাতির পতনের কারণ।

উম্মাহর দুর্বলতা তখনই শুরু হয় যখন সে তার ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোতে শত্রুদের সাথে সমঝোতায় আসে। জাতির পতন এখান থেকেই শুরু হয়।

মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই কোনকিছু সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয় না।

লোকে কোনো একটি মতামতকে শ্রদ্ধা আর দৃঢ় বিশ্বাস করে বলেই সেটি সত্যে পরিণত হয় না।

"তারা হলো সে সব লোক, দুনিয়ার জীবন যাপনে যাদের চেষ্টা সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে আর তারা নিজেরা মনে করছে যে, তারা সঠিক কাজই করছে।"

(সূরাহ আল-কাহফ ১৮:১০৫)

আল্লাহর এমনও অনেক বিধান রয়েছে যা মানুষের সীমিত বুঝ-জ্ঞানের বিপরীতে যায়।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো সেই মুনাফিক্ব যে নিজের জিহ্বাকে ব্যবহার করতে জানে।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফিতনা হলো সত্যকে বিকৃত করার ফিতনা। আর সবচেয়ে ভয়ানক যুদ্ধ হলো স্লোগানের যুদ্ধ। যেখানে বাগপটুতা সবচেয়ে বড় অস্ত্র। নবীজী ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মাতের জন্য সবচেয়ে বেশি ভয় করি সেই মুনাফিক্বের যে নিজের জিহ্বাকে ব্যবহার করতে জানে।"

যারা খণ্ডিত ইসলামের প্রচার করে তাদেরকেই মিডিয়া মাথায় তুলে নাচে।

ইসলাম হলো উম্মাহকে পরিচালিত করার একটি পূর্ণাঙ্গ সিস্টেম। একে টুকরো টুকরো করা অসম্ভব। কারণ একে ফিতরাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু মিডিয়া চায় ইসলামকে কিছু নীতিকথার সমষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করতে। যারা এরকম খণ্ডিত ইসলাম প্রচার করে, তাদের উপরও মিডিয়া অনেক আলো ফেলে।

খুঁটি বাকা হলে পতাকা নিজে নিজে সোজা হতে পারে না।

বাতিল কখনো হককে পরাজিত করতে পারে না। তবে নিজেদের দুর্বলতার কারণে হকপন্থীরা পরাজিত হতে পারে। তারা যদি নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তুলতো, তাহলে তাদের হাতেই হয়তো হকের বিজয় সূচিত হতো। কারণ খুঁটি বাকা হলে পতাকা নিজে নিজে সোজা হতে পারে না।

তিনটি গুন!

উম্মাহ টিকে থাকবে কি না, তা তিনটি গুণের উপর নির্ভর করে,

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে গেলে অতি সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন—

-যাদেরকে তিনি ভালবাসেন আর তারাও তাঁকে ভালবাসবে,

-তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে,

-তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে।" (সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৫৪)

ফলাফলের দিকে তাকিয়েই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

ফলাফলের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজকে বিচার করা ঠিক না। এর ফলে শুরু ও শেষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। রাসূল ﷺ মাসজিদে দ্বিরার ভেঙে ফেলেছিলেন। কারণ এমনিতে এটি সালাত আদায়ের জন্য তৈরি করা হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো মুনাফিক্বদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

সত্যের টিকে থাকার জন্য মিথ্যার সাথে দর কষাকষি করার দরকার পড়ে না।

কোমলতার সাথে সত্যকে উপস্থাপন করার অর্থ এই নয় যে সত্য দুর্বল। এমনও না যে মিথ্যার সাথে দর কষাকষি করে কোনো সমঝোতায় আসা যাবে। নবীগণ ছিলেন সবচেয়ে কোমল, কিন্তু তাঁরা হকের উপর অবিচল ছিলেন এবং বাতিলের সাথে সকল সমঝোতাকে প্রত্যাখ্যান করতেন।

ইসলাম হলো সূর্যের মতো।

আল্লাহ্‌র জমিনে ইসলাম হলো সূর্যের মতো। এটি কখনোই বিলীন হয়ে যায় না। একটি ভূমিতে অস্ত গেলে অন্য ভূমিতে উদিত হয়।

ইসলামের পোশাক মাটিতে ফেলা যায় না।

ইসলাম এমন এক পোশাক যাকে মাটিতে ফেলা যায় না। কেউ তা ছুঁড়ে ফেললে আল্লাহ্ তা অন্য কাউকে পরান।

“যদি তারা একে অস্বীকার করে, তাহলে আমি এর ভার এমন সম্প্রদায়ের কাছে সোপর্দ করেছি যারা অস্বীকারকারী নয়।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৮৯)

সঠিক পথে চলাটা জরুরি, লক্ষ্যে পৌছানো নয়।

লক্ষ্যে পৌঁছাতে না পারার অর্থ এই না যে, সেটা ভুল পথ। কারণ সঠিক পথে চলাটা জরুরি, লক্ষ্যে পৌছানো নয়। হাশরের মাঠে কোনো নবী হাজির হবেন মাত্র একজন অনুসারী নিয়ে, আরেকজন হাজির হবেন একা। তাই বলে তাদের পথ ভুল ছিলো না।

সত্যকে চেনার পথে বড় বাধা ব্যক্তিপূজা।

আপনার এবং সত্যের মাঝে যদি এমন কাউকে দাঁড় করান যাকে আপনি প্রচণ্ড সম্মান করেন, তাহলে সত্যকে আপনি দেখতে পাবেন না। কারণ সত্য তখন নিজেকে ওই ব্যক্তির আড়ালে লুকিয়ে ফেলবে। বরং সত্যকে যথেষ্ট সম্মান দিন, তাহলে একে দেখতে পাওয়ার পথের সকল আড়াল ধ্বংস হয়ে সত্য আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে।

বাতিনী গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারলে নির্দয়ভাবে তাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেয়।

বাতিনী গোষ্ঠীগুলো ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারলে নির্দয়ভাবে তাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেয়। বাতিনীদের মাঝে সবচেয়ে কুখ্যাত হলো রাফিদ্বা (শি'য়া) সম্প্রদায়, আর রাফিদ্বাদের মাঝে সবচেয়ে কুখ্যাত হলো নুসাইরি সম্প্রদায় (এরা মূলত সিরিয়ায় বসবাসকারী শি'য়াগোষ্ঠী। বাশশার আল আসাদ এ গোষ্ঠীর লোক)। এরা বারংবার নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে প্রতিশোধকে জায়েয করতে চায়।

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মুমিন ও মুনাফিক আলাদা হয়ে যায়।

আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আসন্ন বিজয়কে প্রলম্বিত করেন। কারণ যতই পরীক্ষা আসে, মুমিন ও মুনাফিক্বের পার্থক্য ততই প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। আর মুমিন ও মুনাফিক্বের কাতার আলাদা না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ কোন জাতিকে বিজয় দান করেন না।

"আল্লাহ যদি চাইতেন, তিনি (নিজেই) তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু (সশস্ত্র সংগ্রামের আদেশ দিয়ে) তোমাদের মধ্যে একদলকে অপরদলের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:৪)

বাতিলপন্থীরা সত্যকে বিকৃত করার পেছনে বেশি শ্রম দেয়।

বাতিলপন্থীরা তাদের ভ্রান্ত মতাদর্শকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চাইতে সত্যকে বিকৃত করার পেছনে বেশি শ্রম দেয়, কারণ এটিই বেশি সহজ। এর ফলে মানুষকে সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ করে তোলাটাই তাদের লক্ষ্য। আর কিছু মানুষ তো থাকবেই যারা বাতিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর অনুসরণ করে না, বরং সত্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে বিকল্প পথ খোঁজে।

সত্যের ব্যাপারে চুপ থাকাটাই ফিতনা।

সত্য কথা বলে মানুষকে বাতিলের গোঁড়ামি থেকে সরিয়ে আনতে চাওয়া ফিতনা নয়। ফিতনা হলো সত্যের ব্যাপারে চুপ থেকে মানুষকে বাতিলের প্রতি আরো গোঁড়া বানানো।

জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মাঝে সমাধান খুঁজতে গিয়ে অনেকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়।

মানুষের মন বিভিন্ন বৈপরিত্য দেখে হিসাব মেলাতে না পেরে উদ্ভ্রান্ত হয়ে যায়। এমনকি নাস্তিকে পরিণত হয়। অথচ বৈপরিত্য কেবল সে যা দেখছে ততটুকুর ভেতরেই। তার অদেখা জগতে তো এমন বিষয় থাকতে পারে যা পুরো গোলমেলে সমীকরণটি সমাধান করে দিতে পারে।

দাঈর চরিত্র হনন করা গেলে দাওয়াতের কার্যকারিতাও আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়।

নবীজীর ﷺ সমসাময়িক মুনাফিক্বরা খোলাখুলি ইসলামের নিন্দা করতে ভয় পেতো। তাই তারা আড়াল থেকে কেবল ইসলামের বিভিন্ন নিদর্শন, নবী ﷺ ও সাহাবাগণের সমালোচনা করতো। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, দ্বীনের দাঈর চরিত্রহনন করা গেলে দাওয়াতের কার্যকারিতাও আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়।

হকপন্থীদের আল্লাহ সমালোচনার হাত থেকে বাঁচান।

সত্যের উপর থাকা ব্যক্তির উপর আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ হলো তাকে

সমালোচনার সম্মুখীন হতে না দেওয়া। ফলে সে সত্য থেকে পিছপা হয় না।

"আর তারা নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" (সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৫৪)

অহংকারীরা দুর্বলদের আদর্শকেও দুর্বল ভাবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শগতভাবে সবচেয়ে উন্নত ব্যক্তিরা ছিলেন খুবই সাধারণ ও দুর্বল। যে কারণে অহংকারীরা সত্যকে মেনে নেয় না, তারা দুর্বলদের দ্বারা প্রচারিত আদর্শকেও দুর্বল ভাবে।

সত্যের পরিমাণটাই আসল, সত্যের অস্তিত্ব নয়।

বেশিরভাগ ভ্রান্ত মতাদর্শেই একটু না একটু সত্য মিশে থাকে। সেই মতাদর্শের অন্ধ অনুসারীরা সেই সত্যটুকুকেই বিরাট বড় করে দেখায়। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সত্যের অস্তিত্ব একটি গোটা মতাদর্শকে হক বলে প্রমাণ করে না। সত্যের পরিমাণটাই আসল, সত্যের অস্তিত্ব নয়।

লোকের কথায় সত্যের অনুসারীরা সত্যকে ত্যাগ করে না।

লোকে সত্যকে নিন্দা করা শুরু করলে সৎ ব্যক্তি সত্যকে ত্যাগ করে না। কারণ সে যখন সত্যকে অনুসরণ করা শুরু করেছিলো, তখন লোকমুখে সত্যের প্রশংসা শুনে একে অনুসরণ করেনি। সত্য সত্য বলেই তাকে সে অনুসরণ করেছে।

সকল জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠরা পথভ্রষ্ট ছিলো।

সত্য কোনো স্লোগান নয় যা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা বুলির মতো আওড়াবে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে যত জাতির কথাই বলেছেন, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই পথভ্রষ্ট। আল্লাহ এই কথা তাঁর কিতাবের প্রায় সত্তরটি জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

চোখের কাছে ধরা একটা পয়সার পেছনে দূরের একটা বড় পাহাড়ও ঢাকা পড়ে যায়।

ছোট ছোট লোভও বিরাট সত্যকে দৃষ্টির আড়াল করে দেয়। চোখের কাছে ধরা একটা পয়সার পেছনে দূরের একটা বড় পাহাড়ও ঢাকা পড়ে যায়।

শাহাওয়াত থেকেই মানুষের মনে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্দেহ জন্ম নেয়।

যে সকল শুবুহাত (সন্দেহ) জন্ম নেয় শাহাওয়াত (খেয়াল-খুশি) এর গর্ভ থেকে, সেগুলো কালক্রমে অলঙ্ঘনীয় সংবিধানের রূপ ধরে। অর্থাৎ, আল্লাহর একটি বিধান পছন্দ না হলে মানুষ সেটাকে সন্দেহ করে, তারপর সেই বিধানের বিপরীত কাজটিকেই ঐশ্বরিক বিধানের মতো মান্য করা শুরু করে।

মিথ্যার অনুসারীরা একেক সময় একেক রূপে হাজির হয়।

ফির'আউন নিজেই রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে জাদুকর এনে জড়ো করিয়েছে মূসাকে ('আলাইহিসসালাম) পরাজিত করার জন্য। তার ভাড়া করা জাদুকররাই যখন তার বিরোধিতা করলো, সে নিজেই তখন তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আখ্যা দিলো, মূসাকে (আলাইহিসসালাম) তাদের নাটের গুরু বানিয়ে দিলো।

"নিশ্চয় সে-ই তোমাদের নাটের গুরু যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে।"

(সূরাহ্ তাহা ২০:৭১)

তীরন্দাজের দৃঢ়তা না থাকলে তীর কখনোই লক্ষ্যে আঘাত হানবে না।

সত্য যদি শক্তিশালী তীরের মতোও হয়, তীরন্দাজের দৃঢ়তা না থাকলে তা কখনোই লক্ষ্যে আঘাত হানবে না।

"বরং আমি সত্যকে মিথ্যের উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা মিথ্যের মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। তৎক্ষণাৎ মিথ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

(সূরাহ্ আল-আম্বিয়া ২১:১৮)

শাহাওয়াতের অনুসারীরা রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করার কথা বলে।

রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণের ধারণাটা পশ্চিমা বিশ্বে জন্ম নিয়েছে। কারণ তাদের ধর্ম বিকৃত আর এটি তাদের রাজনীতিকে দূষিত করে দিচ্ছিলো। আর প্রাচ্যে এই ধারণা আমদানি হয়েছে কারণ এখানকার রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিগ্রস্ত আর ধর্ম তাদের বাহাদুরিকে নষ্ট করে দেবে।

সত্যের উপর অবিচল থাকার আসল পরীক্ষা।

লোকে যখন সত্যকে গ্রহণ করে নেয়, তখন সত্যের অনুসরণ সহজ। কিন্তু লোকে যখন সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, চারদিকে যখন সত্যের বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়, তখন সত্যের উপর অবিচল থাকাটাই আসল পরীক্ষা।

এখন ইয়াহুদীরা চক্রান্ত করে আর মুনাফিক্করা অর্থায়ন করে।

অতীতে মুনাফিক্করা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতো আর ইয়াহুদীরা টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতো। আর আজকে ইয়াহুদীরা চক্রান্ত করছে আর মুনাফিক্করা অর্থায়ন করছে।

"তারা চক্রান্ত করে, আর আল্লাহ্ও কৌশল করেন। আর আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।" (সূরাহ্ আল-আনফাল ৮:৩০)

বিপদের সময়েই ঈমানের আসল পার্থক্যটা ধরা পড়ে।

আল্লাহ্‌র দ্বীনের পক্ষে কথা বলতে আর দ্বীন পালন করতে সবাই পারে। কিন্তু বিপদের সময়েই আসল পার্থক্যটা ধরা পড়ে। পেরেক শক্ত করে গেঁথেছে কি না তা বোঝা যায় ধরে নাড়া দিলে।

মুনাফিকরা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে দ্বীনের ক্ষতি করতে চায়।

সত্যের গলা টিপে ধরার জন্য মুনাফিক্বদের একটি হাতিয়ার হলো অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ।

"তারা বলে, 'রাসূলের সঙ্গীসাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় কোরো না। শেষ পর্যন্ত তারা এমনিতেই সরে পড়বে।' আসমান ও জমিনের ধনভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিক্বরা তা বোঝে না।" (সূরাহ আল-মুনাফিক্বুন ৬৩:৭)

বাতিলপন্থীরা চায় না বাতিলের পথে তারা একা থাকুক।

বাতিলপন্থীরা চায় সবাই যেন তাদের মতো হয়ে যায়। যাতে সে ভ্রান্ত পথে চলার সময় একাকীত্বে না ভোগে।

"তারা চায় যে তারা যেভাবে কুফরি করেছে তোমারাও যেন সেভাবে কুফরি করো, যাতে তোমরা সমান হয়ে যাও।" (সূরাহ আন-নিসা ৪:৮৯)

"তারা নিজেরা পথভ্রষ্টতার সওদা করে আর চায় তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও।"

(সূরাহ আন-নিসা ৪:৪৪)

অহংকার স্বৈরাচারীর দৃষ্টিতে সবকিছুকে ছোট করে দেয়।

স্বৈরাচারী যতক্ষণ না সত্যের আঘাতে ধ্বংস হয়ে যায়, ততক্ষণ সে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। অহংকার তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুকে ছোট করে দেয়।

"অতঃপর ফির'আউন শহরে নগরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিলো (এই বলে যে,) এরা (বানী ইসরাঈল) তো ক্ষুদ্র একটি দল।" (সূরাহ শু'আরা ২৬:৫৩-৫৪)

ইবনে 'আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহ 'আনহু) বলেন, "মুসার ('আলাইহিসসালাম) সাথে ছয় লক্ষ মানুষ ছিলো।" ফির'আউনের অহংকার তার কাছে মূসার বাহিনীকে ছোট করে দেখালো।

সালিহ ('আলাইহিসসালাম) এর জাতি মাত্র নয়জন লোকের কারণে ধ্বংস হয়েছিলো।

বিপর্যয় সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীটি খুবই ছোট হয়ে থাকে যারা জনগণকে বিপর্যয়ের দিকে ডাকে। সালিহ ('আলাইহিসসালাম) এর জাতি মাত্র নয়জন লোকের কারণে ধ্বংস হয়েছিলো। "আর সেই শহরে ছিলো নয়জন ব্যক্তি যারা ভূমিতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াতো এবং সংশোধন করতো না।" (সূরাহ আন-নামল ২৭:৪৮)

আল্লাহ কাফিরদের চেয়ে মুনাফিক্বদের ব্যাপারে বেশি সতর্ক করেছেন।

ইসলাম একটি দালানের মতো। মুনাফিক্বেরা ভেতর থেকে এর ভিত্তিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে আর কাফিরেরা বাইরে থেকে দেয়ালে আঘাত করে। এ কারণে আল্লাহ কাফিরদের চেয়ে মুনাফিক্বদের ব্যাপারে বেশি সতর্ক করেছেন।

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমাদের ভালো কথায় কান দিবেন না।

পশ্চিমারা যদি বলে, 'ইসলামের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই,' তাহলে হয় তারা মিথ্যা বলছে আর নয়তো আমরা সঠিক ইসলামের পথে নেই।

"ইয়াহূদী ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ করো।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:১২০)

পথভ্রষ্টদের প্রাচুর্য তাদের ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করে।

পথভ্রষ্টরা ভাবে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন বলে তাদেরকে রিযিক্ব দিচ্ছেন। আসলে আল্লাহ তাদের রশি ঢিল দিয়ে ভুল পথে চলা সহজ করে দিচ্ছেন, যাতে সময়মতো তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

"তারা কি ভেবে নিয়েছে, আমি যে তাদেরকে ধনৈশ্বর্য ও সন্তানাদির প্রাচুর্য দিয়ে সাহায্য করেছি এর দ্বারা কি তাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না।"
(সূরাহ আল-মু'মিনূন ২৩:৫৫-৫৬)

অহংকারীরা সত্যের অনুসারীদের খুঁটিনাটি ভুল খোঁজে।

যাদের হৃদয় সত্যের খোঁজে থাকে তারা মূল বার্তাটার দিকে মনোযোগ দেয়। আর অহংকারীরা সেই বার্তার অনুসারীদের খুঁটিনাটি ভুল খোঁজে। তাদেরকে ঘৃণা করে বলে তাদের বার্তাটাকেও ঘৃণা করে।

"তারা (মুমিনগণ) বলেছিলো, 'তিনি যে বাণী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তাতে বিশ্বাসী।' যারা অহংকার করেছিলো তারা বলেছিলো, 'তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছো, আমরা তাতে অবিশ্বাস করছি।' (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:৭৬-৭৭)

টিকে থাকার জন্য নিজের পাশাপাশি অন্য মতাদর্শ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা রাখা জরুরী।

নিজেদের আদর্শের উপর তারাই সবচেয়ে দৃঢ় থাকতে পারে, যারা সমমনাদের পাশাপাশি বিরোধী গোষ্ঠীর মতাদর্শ সম্পর্কেও ভালো জ্ঞান রাখে। ফলে তারা এই দুটি আদর্শকে গুলিয়ে ফেলে না।

"এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়।" (সূরাহ আল-আন'আম ৬:৫৫)

সত্য একসময় ঠাট্টা-তামাশার শিকার হয়।

সত্যের আহ্বান সর্বদাই ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে শুরু হয়, ঠাট্টা-তামাশার শিকার হয়, আর সবশেষে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

"তাদের কাছে এমন কোনো রাসূল আসেনি যাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি।"
(সূরাহ আল-হিজর ১৫:১১)

জালিমরা আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়, আল্লাহ্র দিকে যেতে চায় না।

স্বৈরাচারী জালিমেরা আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার ব্যাপারে এতই আত্মবিশ্বাসী যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আল্লাহর দিকে যেতে চায় না।

"তারা যখন আমার শাস্তি (এর আগমন) অনুভব করলো, তখন তা থেকে পালিয়ে যেতে (চেষ্টা করতে) লাগলো।" (সূরাহ আল-আম্বিয়া ২:১২)

মাঝে মাঝে শত্রুরা সত্যের অনুসারীদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

প্রায়ই দেখা যায় শত্রুদের কারণে কারো মর্যাদা বেড়ে যায়। শত্রুরা তার ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। লোকেরা দৌড়ে গিয়ে দেখতে চায় আসল ঘটনা কী। তারপর শুধু ভালো ভালো জিনিসই খুঁজে পায়। এতে মানুষের কাছে সেই ব্যক্তির মর্যাদাই বরং বেড়ে যায়। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলের ﷺ নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়াতো। আর মানুষ আসল ঘটনা জানতে গিয়ে সত্যটা জেনে বরং ইসলাম গ্রহণ করতো।

মুসলিমদের মাঝেও বাতিলের পক্ষের লোক থাকবে।

নূহ (আলাইহিসসালাম) ও লূত (আলাইহিসসালাম) এর স্ত্রীদ্বয় সত্যের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অথচ তাদের স্বামীরা ছিলেন নবী। তাই মুসলিমদের সারিতে বাতিলের চর থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং তাদের না থাকাটাই অস্বাভাবিক।

ফির'আউনের উত্তরসূরি প্রত্যেক জাতির মাঝেই আছে।

হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আবার সেই অন্যায় রক্তপাতের পক্ষে নিজ জাতির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা প্রথম ব্যক্তি ছিলো ফির'আউন। আর প্রতিটি জাতির ভেতরেই ফির'আউনের উত্তরসূরি আছে।

"ফিরআউন বললো, 'ছেড়ে দাও আমাকে, আমি মূসাকে হত্যা করবো, ডাকুক সে তার রব্বকে। আমি আশঙ্কা করছি, সে তোমাদের জীবন পদ্ধতিকে বদলে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।'" (সূরাহ গাফির ৪০:২৬)

জালিমের কৌশল হলো সমাজকে বিভক্ত করে দুর্বল করে দেওয়া।

সমাজকে খণ্ডবিখণ্ড করে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়াটাই জালিমদের কৌশল (কর্মপদ্ধতি)। যাতে সমাজ কখনো তাঁর জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে।

"বস্তুতঃ ফির'আউন দেশে উদ্ধত হয়ে গিয়েছিলো আর সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে দুর্বল করে রেখেছিলো, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করতো আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখতো; সে ছিলো ফাসাদ সৃষ্টিকারী।" (সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৪)

জালিম তাঁর অনুসারীদের জন্য পুরষ্কার ঘোষণা করে।

সত্যের সাথে সংঘাত চলাকালে জালিম কাউকে কাছে টানলে অবশ্যই পুরষ্কারের ঘোষণা দিয়ে টানে। জাদুকররা ফির'আউনকে বলেছিলো,

"'আমরা জয়লাভ করলে আমাদেরকে পুরষ্কার দেওয়া হবে তো?' সে (ফির'আউন) বললো, 'হ্যাঁ। তখন তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'" (সূরাহ আশ-শু'আরা ২৬:৪১-৪২)

অস্থিতিশীলতার আশংকা একটা অজুহাত!

অস্থিতিশীলতার আশংকার কথা বলে যেসব দেশ আল্লাহর আইন পরিত্যাগ করে দূরদেশের প্রভুদের খুশি করতে চায়, তাদের কথাবার্তা কুরাইশ মুশরিকদের মতোই।

"তারা বলে, আমরা যদি তোমাদের সাথে সৎপথের অনুসরণ করি, তাহলে আমরা আমাদের ভূমি থেকে উৎখাত হবো।" (সূরাহ আল-ক্বাসাস ২৮:৫৭)

জালিম যখন জনসমর্থনকে সাথে পায়, তখন তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ভান করে।

"ফির'আউন বললো, 'আমায় মূসাকে হত্যা করতে দাও।'" (সূরাহ গাফির ৪০:২৬)

সে এর আগেও গণহারে নবজাতক শিশুদের হত্যা করেছে। তখন কারো অনুমতির তোয়াক্কা করেনি। জালিমদের কাজকারবার এমনই হয়। যখন নিশ্চিত জানে যে জনসমর্থন পাবে না, তখন জোর করে কাজ করে। আর যখন জনসমর্থনকে সাথে পায়, তখন তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ভান করে।

তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ব্যাকডেটেড আখ্যা দেয়।

দ্বীন ইসলামকে ব্যাকডেটেড আখ্যা দেওয়াটা আজকের যুগেই শুরু হয়নি। নবীজীর ﷺ সমসাময়িক জাহিল লোকেরাও আল্লাহর আইনকে ব্যাকডেটেড বলে আখ্যা দিতো।

"কাফিররা বলে, এটা তো পূর্বেকার লোকেদের গল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই না।"

(সূরাহ আল-আন'আম ৬:২৫)

শাম হকপন্থীদের ভূমি, সেখানে মিথ্যার অনুসারীরা টক্কর দিতে পারবে না।

দাজ্জাল হলো দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড় ফিতনা। তার মৃত্যু হবে শামের ভূমিতে। রাসূল ﷺ বলেন, 'দাজ্জাল উহুদের পেছনে নেমে আসবে। আর ফেরেশতাগণ তার চেহারা শামের দিকে ফিরিয়ে দিবেন। সেখানেই সে ধ্বংস হবে।' (সহিহ মুসলিম: ৩৪১৭)

মাসীহ দাজ্জাল শামে পরাজিত হবে, তাহলে আজ যেসব ছোট দাজ্জাল শামের সাথে টক্কর দিতে চাচ্ছে তাদের পরিণাম কেমন হবে?

কম জরুরী বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা আলেমদের জন্য ফিতনা।

ফিতনা কয়েক রকমের হতে পারে। এর একটি হলো সত্যকে পরিত্যাগ করা। আরেকটি হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে ছেড়ে কম গুরুত্বপূর্ণটি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। প্রথমটি সাধারণ জনগণের ফিতনা। দ্বিতীয়টি আলেমগণের।

কেউ কেউ সত্যের পক্ষে লড়াইয়ের ভান করে।

কেউ কেউ এমনও আছে যারা সত্যের পক্ষ নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যদি দেখেন শত্রুদের মাঝে বড়টিকে ছেড়ে সে ছোটটির পেছনে লেগে আছে, সে আসলে আপন স্বার্থ হাসিলের জন্যই সত্যের পক্ষে লড়াইয়ের ভান করে।

অশ্লীলতা ও নগ্নতার প্রসার শয়তান ও তাঁর অনুসারীদের পদ্ধতি।

অতিরিক্ত সাজসজ্জা, অশ্লীলতা আর নগ্নতার প্রসার ঘটানো হলো ইবলিস ও তার অনুসারীদের প্রথমদিককার একটি চাল।

"হে আদাম সন্তান! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিলো। সে তাদের পরস্পরকে লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের দেহ হতে পোশাক খুলিয়ে ফেলেছিলো। (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২৭)

সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই।

সত্য যখন মিথ্যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, নিরপেক্ষতার ভাব ধরা তখন ভণ্ডামি।

"তারা মাঝখানে দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে; বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি তার জন্য কক্ষনো কোনো পথ পাবে না।" (সূরাহ আন-নিসা ৪:১৪৩)

হকের পথে বিজয়ী হওয়াটা মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো অবিচল থাকা।

হকের পথ দীর্ঘ। এ পথে চলতে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারলে আল্লাহ আপনাকে এর জন্য জেরা করবেন না। কিন্তু এ পথে অবিচল থাকতে না পারলে সেটার জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

মিথ্যার মাঝে থেকে যারা অভ্যস্ত সত্যকে তারা সহ্য করতে পারে না।

অন্ধকারেই যাদের বসবাস, একসময় সেই অন্ধকারেই তাদের চোখ সয়ে যায়, আলো আর তাদের সহ্য হয়না। তেমনিভাবে মিথ্যার মাঝে থেকে যারা অভ্যস্ত সত্যকে তারা সহ্য করতে পারে না।

"যারা ক্বিয়ামতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের উল্লেখ করা হলেই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়।" (সূরাহ আয-যুমার ৩৯:৪৫)

লোকেরা সত্যকে অস্বীকার করছে দেখে বিভ্রান্ত হবেন না, অনেক জ্ঞানীগুণী এর আগে সত্যকে অস্বীকার করেছে।

আপনি সত্যকে খুঁজে পাওয়ার পর যদি দেখেন কেউ একে অস্বীকার করছে, তাহলে স্মরণ করুন যে, এর আগেও আপনার সমমানের বা এরচেয়ে মর্যাদাবান অনেকেই এই সত্যকে হাতের কাছে পেয়েও অস্বীকার করেছে। সেজন্য সত্য পরিবর্তন হয়ে যায়নি কিংবা এর ভীত নড়বড়ে হয়নি। নিজেকে এই বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দিন, তাহলে আপনি সত্যের উপর অটল থাকতে পারবেন।

"লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তাহলে (জেনে রেখো এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়) তাদের পূর্বে নূহ, আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ও (তাদের রাসূলদের) অস্বীকার করেছিলো। আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়ও (অস্বীকার করেছিলো)। আর মাদইয়ানবাসীরাও...।" (সূরাহ আল-হাজ্জ ২২:৪২-৪৪)

ফিতনা হলো সত্য-মিথ্যা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া আর কোনটিকে অনুসরণ করতে হবে তা বুঝতে না পারা।

হকের পথে চলার সময় পথের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত থাকা হলো ফিতনা। অজ্ঞতা এই ফিতনাকে আরো বৃদ্ধি করে, আর জ্ঞান এটিকে অপসারণ করে। হুযায়ফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "ফিতনা হলো সত্য-মিথ্যা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া আর কোনটিকে অনুসরণ করতে হবে তা বুঝতে না পারা।"

(মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবাহ, বর্ণনা নং ৩৮৪৪৭)

মানুষ দীর্ঘ সময় চিন্তাভাবনা করেও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মানুষ তার চিন্তাবুদ্ধির কারণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, যদিও সে লম্বা সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

"সে চিন্তা ভাবনা করলো এবং সিদ্ধান্ত নিলো, ধ্বংস হোক সে, কীভাবে সে (কুরআনের অলৌকিকতা স্বীকার করার পরও কেবল অহমিকার বশবর্তী হয়ে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার) সিদ্ধান্ত নিলো! আবারো ধ্বংস হোক সে, সে সিদ্ধান্ত নিলো কীভাবে! তারপর সে তাকালো।" (সূরাহ আল-মুদ্দাসসির ৭৪:১৮-২১)

এই আয়াতে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহর কথা বলা হয়েছে। দীর্ঘসময় নিয়ে ভেবে সে ভুল সিদ্ধান্তে এসেছিলো।

যাদের অন্তরে গোঁয়ার্তুমি থাকে তারাই সত্যকে অস্বীকার করে।

যারা সত্যকে নিরপেক্ষভাবে দেখে, তারা মুহূর্তেই তা গ্রহণ করে নেয়। আর যাদের অন্তরে গোঁয়ার্তুমি থাকে, তারা যতই সময় নিক শেষ পর্যন্ত পথভ্রষ্টই হবে। নূহের (আলাইহিসসালাম) জাতি ৯৫০ বছর সত্যের আহ্বান শুনেছে। অথচ অল্প

কয়েকজনই ঈমান এনেছে।

মিথ্যাকে নীরবতার মাধ্যমে কবর দাও।

মিথ্যা জন্ম থেকেই মৃত। এতে প্রাণের সঞ্চার হয় যখন মানুষ এর প্রতি সাড়া দেয়। তাই মিথ্যার বার্তাগুলোকে নিয়ে বেশি হৈচৈ না করে একে দমিয়ে রাখতে হয়, আর সত্যকে বারবার আওড়িয়ে যেতে হয়। এক আসারে আছে, "মিথ্যাকে নীরবতার মাধ্যমে কবর দাও আর সত্যকে বারবার উল্লেখ করে তাকে জীবিত করো।"

যার সাথে আলো নেই সে নিজের জন্যই বাঁচে, নিজের জন্যই মারা যায়।

আলো থেকে যার দূরত্ব যত কম, তার ছায়া তত লম্বা। তেমনিভাবে যারা সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী, তাদের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। যার সাথে আলো নেই, তার ছায়াও নেই। সে নিজের জন্যই বাঁচে, নিজের জন্যই মারা যায়।

দলের ট্রেন্ড অনুযায়ী নয়, কুরআন সুন্নাহর দলীল থেকে মধ্যমপন্থা খুঁজুন।

মধ্যমপন্থা খুঁজতে হলে কুরআন-সুন্নাহর দলীল থেকে খুঁজতে হয়। যারা বিভিন্ন দলের ট্রেন্ড অনুসরণ করে, তারা বড় ভুল করছে। ট্রেন্ডের বাতাস ঘুরে গেলে এদের মধ্যমপন্থাও ঘুরে যায়। অথচ দলীল থেকে মধ্যমপন্থা চিনলে তারা এর উপরই অবিচল থাকতো।

তাদের ব্যাপারে আফসোস করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না।

বাতিলের উপর এর অনুসারীদের অবিচলতা দেখে বিভ্রান্ত হবেন না। বরং আল্লাহর ক্ষমতার কথা ভাবুন, তাদের চোখের সামনে হক থাকার পরও আল্লাহ হককে তাদের দৃষ্টি থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

"তিনি যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। কাজেই তাদের ব্যাপারে আফসোস করে নিজেকে ধ্বংস কোরো না।" (সূরাহ ফাতির ৩৫:৮)

ধৈর্যই হচ্ছে সব থকে বড় অস্ত্র।

প্রত্যেক সত্য প্রচারকদেরই প্রতিপক্ষ থাকে। প্রতিপক্ষরা দীর্ঘ দিন বিরোধিতা করবে, কিন্তু অবশেষে গায়েব হয়ে যাবে। আর ধৈর্যই হচ্ছে এদের গায়েব করার সব থকে বড় অস্ত্র।

"তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে মিথ্যে মনে করা হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যে মনে করা এবং কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসেছে।" (সূরাহ আল-আন'আম ৬:৩৪)

ফিতনার আসল কারণ।

মুসলিমরা যখন বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে গেলো, তখনই শাসকরা একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো আর নিজের পছন্দমতো হকের গলা টিপে ধরতে

লাগলো। ইবনে মাস’উদকে (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) ফিতনার যুগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, “যখন তোমাদের মাঝে তিলাওয়াতকারী বেড়ে যাবে ও আলেমের সংখ্যা কমে যাবে এবং শাসকের সংখ্যা বেড়ে যাবে।”

হককে প্রথমত হকের বৈশিষ্ট্য দিয়েই চিনতে হয়।

বাতিলপন্থীরা আপনার বিরোধিতা করে মানেই এটা না যে, আপনি পুরোপুরি হকের পথে আছেন। বরং এমনও হতে পারে যে, তাদের মত করে বাতিলের অনুসরণ করছেন না বলেই তারা আপনার বিরোধিতা করছে। হককে প্রথমত হকের বৈশিষ্ট্য দিয়েই চিনতে হয়। বাতিলের পক্ষ থেকে বিরোধিতা আসাটা পরের বিষয়।

সত্য থেকে যারা বারবার মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা আর হিদায়াত পাবে না।

সত্য থেকে যারা বারবার মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা শেষপর্যন্ত মিথ্যের উপরই কঠিন হয়ে জমে থাকে। মিথ্যের উপর তাদের এই অবিচলতা তাদের হক হওয়ার লক্ষ্মণ নয়, বরং আল্লাহ্‌র হেদায়াত থেকে তারা চিরতরে বঞ্চিত।

“যারা ঈমান আনলো, অতঃপর কুফরী করলো আবার ঈমান আনলো আবার কুফরী করলো, অতঃপর কুফরীতে অগ্রসর হতে থাকলো, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং পথপ্রদর্শন করবেন না।” (সূরাহ আন-নিসা ৪:১৩৭)

ইলম আর আমল যাকে দু’দিক থেকে ঠেস দিয়ে আছে, তার পতন ঘটা অসম্ভব।

সত্য থেকে যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার প্রথমে কর্মে (আমল) ঘাটতি দেখা দেয়। তারপর তার জ্ঞানে (ইলম) ঘাটতি দেখা দেয়। সত্য থেকে মুখ ফেরানো মানেই পতন ঘটা। পক্ষান্তরে যে সত্যের উপর আছে তাঁর পাথেয় হলো ইলম আর আমল। ইলম আর আমল যাকে দুদিক থেকে ঠেস দিয়ে আছে, তার পতন ঘটা অসম্ভব।

সত্যের অনুসরণের পাশাপাশি কোন ব্যক্তির অনুসরণ সত্যপন্থীদের জন্য বড় ফিতনা।

সত্যকে অনুসরণের পাশাপাশি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে আঁতাত করাটা হকপন্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা। তখন অমুক ব্যক্তি হক কথা বলেন দেখেই হকের অনুসরণ করা শুরু হয়, হকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে নয়। অমুক ব্যক্তি সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অনুসারীরাও একই কাজ করে।

পথভ্রষ্টতার শেষ সীমায় পথভ্রষ্ট ব্যক্তি হকপন্থীদেরকে করুণা করার ভাব করে।

পথভ্রষ্ট লোক তার মতামতকে সঠিক মনে করতে করতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, হকপন্থীদেরকেই সে অতি জযবাওয়ালা ভেবে করুণা করতে থাকে।

“মুনাফিক্বরা আর যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা বলে, ‘এই লোকগুলোকে তাদের দ্বীন ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে।’” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:৪৯)

বাতিলকে সৃষ্টি করার একটি হিকমাহ।

হকপন্থীরা যদি নিজেদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে, তাহলে আল্লাহ বাতিলপন্থীদেরকে এত শক্তিশালী করে দিবেন যে হকপন্থীরা তাদের ভয় পেতে শুরু করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হবে। এটি হলো বাতিলকে সৃষ্টি করার একটি হিকমাহ।

ওয়াহী হলো একটি উজ্জ্বল আলো।

ওয়াহী হলো উজ্বল একটি আলো। যে এর পেছন পেছন চলে, সে পথ দেখতে পায়। আর যে এর মুখোমুখি দাঁড়ায়, সে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌র জন্য যে পথচলা শুরু হয়েছিলো একসময় তা খাহেশাতের দাসত্বে রূপ নেয়।

অনেকে বাতিলকে হক ভেবে বাতিলের পথে চলতে শুরু করে। চলতে চলতে একসময় সে আসল ঘটনা বুঝতে পারে। কিন্তু তখন হকের পথে ফিরে আসা খুবই কঠিন হয়ে যায়। তখনই সে তার বাতিল পথকে জোরেসোরে আঁকড়ে ধরে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য যে পথচলা শুরু হয়েছিলো, এভাবেই তা খাহেশাতের দাসত্বে পর্যবসিত হয়।

সত্য তার আপন গুণেই সত্য।

সত্য তার আপন গুণেই সত্য। কে একে অনুসরণ করলো বা না করলো, তাতে কিছু আসে যায় না। দাজ্জালের কপালে ‘কাফির’ লেখা থাকার পরও অনেক নামধারী মুসলিম তার অনুসারী হবে। এত স্পষ্ট হওয়ার পরও যদি মিথ্যের এতো অনুসারী হয় তাহলে কিছুটা মিথ্যা মিশ্রিত সত্যের অনুসারী কত হতে পারে ভাবুন!

আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে তারা তাদের পাতা ফাঁদে নিজেরাই ফেঁসে যাবে।

আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করে, তাদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র আসলে তাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে । আজ তারা এতে আনন্দ পাচ্ছে, কিন্তু কাল এর উপরই হোঁচট খাবে।

“...অপরাধী প্রধানদেরকে চক্রান্তজাল বিস্তার করার সুযোগ দিয়েছি কিন্তু এ চক্রান্তের ফাঁদে তারা নিজেরাই পতিত হয়, কিন্তু সেটা তারা উপলব্ধিই করতে পারে না।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:১২৩)

ভ্রান্ত মতবাদগুলোর উদাহরণ হলো ধূলিকণার মতো।

কিছু মতবাদ হলো ধূলিকণার মতো। কোনো পাত্রকে ধরে ঝাঁকি দিলে তলায় পড়ে থাকা ধূলোবালি উপরে উঠে আসে। কোথাও গোলমাল লাগলে এসব মতবাদও সেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কাজেই বিভ্রান্ত হবেন না। পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলেই এগুলো আবার পাত্রের তলায় চলে যাবে।

সত্যের তুলনায় মিথ্যার অবস্থান খুবই নগণ্য।

সত্য একটি পর্বতের মতো। ধূলিকণা তাকে অদৃশ্য করতে পারে না। কিছুক্ষণের জন্য দেখতে বাধা দিতে পারে মাত্র। আর সত্যের জীবনকাল তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বেশি।

কোনো কিছুর প্রাচুর্য থাকলে এবং তা ব্যাপকভাবে ছড়ালেই তা ঠিক হবে, এটা ভাবা ঠিক নয়। নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াত দেওয়ার পুরোটা সময় মন্দের প্রাচুর্য ছিলো। সত্য নিজ গুণেই প্রাচুর্যশালী। আর মিথ্যার পক্ষে যদি সকলেও থাকে, তবুও তা নিজ গুণেই ক্ষুদ্র।

ইবাদাত ও আত্মশুদ্ধি

আমল ছাড়া তত্ত্বীয় ইলমের কার্যত কোন মূল্য নেই। আর আমলই হলো বান্দার আত্মার পরিশুদ্ধির সবচেয়ে বড় উপায়। নিজেদের হৃদয়গুলোকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল রাখা এবং সেই ইবাদাতে সুন্নাহর অনুসরণ সবচেয়ে জরুরী বিষয়। এই অধ্যায়ে তাই শাইখের ইবাদাত এবং আত্মশুদ্ধিমূলক আলোচনাকে একত্রিত করা হয়েছে। কিয়ামুল লাইল, রমযান, কুরবানি, দু'আ, সালাত, বান্দার আত্মার পরিশুদ্ধির নানান পাথেয় এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু।

কিয়ামুল লাইলের জন্য পূর্ণরাত্রি জাগরণ করা।

কিয়ামুল লাইল আদায়ের উদ্দেশ্যে ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত পূর্ণরাত্রি জাগরণ করা সুন্নাহর বিপরীত। তবে রমযানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। রমযান মাসের সুন্নাহ হলো, সামর্থ্য থাকলে কিয়ামুল লাইলের জন্য পূর্ণরাত্রি জাগরণ করা। যে এই আমল করতে সমর্থ তার জন্য উত্তম হলো রাতে না ঘুমিয়ে দিনের বেলা ঘুমানো।

বান্দার পরহেজগারির চিহ্ন হলো কিয়ামুল লাইল।

আল্লাহ্ সারাবছরব্যাপীই কিয়ামুল লাইলের বিধান রেখেছেন এবং একে পরহেজগারির চিহ্ন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

“বিছানা হতে তাদের পার্শ্ব পৃথক থাকে।**”** (সূরাহ আস-সাজদাহ ৩২:১৬)

অতএব, যাদের কিয়ামুল লাইল করার সামর্থ্য আছে তাদের উচিত রাতের শেষাংশে তা আদায় করা। অন্যথায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিতর পড়ে নেওয়া।

রাতের শেষভাগে যারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে।

কেউ যদি তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে না-ও পারে, অন্তত ইস্তিগফার করতে হলেও যেন ওঠে। কারণ রাতের শেষভাগের দু'আ হলো এমন এক তীর যা কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আর এটা রাহমানের বান্দাদের আমল যা কুরআনে বর্ণিত আছে।

“আর যারা রাতের শেষভাগে ক্ষমাপ্রার্থনা করে।**”** (সূরাহ আলি ‘ইমরান ৩:১৭)

জ্ঞানের মিষ্টি ফল হলো তাহাজ্জুদ সালাত।

যে জ্ঞান আপনাকে তাহাজ্জুদের জন্য তুলতে পারে না, তা আসলে জ্ঞান নয়, অজ্ঞতা।

“যে রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সিজদা ও দণ্ডায়মান অবস্থায় বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে আর তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে তা করে না)? বলুন, ‘যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান?’**”** (সূরাহ আয-যুমার ৩৯:৯)

মু’মিনের উচিত তার হৃদয় ও হাতকে দু’আয় অভ্যস্ত করা।

ইবাদাতের সবচেয়ে স্পষ্ট ও সহজ পদ্ধতি হলো দু’আ করা। নবীজী ﷺ বলেছেন, **“**দু’আ হলো ইবাদাত।**”** (আবু দাউদ, তিরমিযি: ২৯৬৯)

এটি ত্যাগ করাও নিষেধ। নবীজী ﷺ বলেন, “আল্লাহ্‌র কাছে যে চায় না, তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হন।” (তিরমিযী: ৩৩৭৩)

তাই মু’মিনের উচিত তার হৃদয় ও হাতকে দু’আয় অভ্যস্ত করা।

পরীক্ষা আর বিপদ-আপদ হলো ক্ষমতায় উঠার মূল।

পরীক্ষা আর বিপদ-আপদ হলো ক্ষমতায় ওঠার মূল। আল্লাহ্ এর ধাপগুলোকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন ঘটান। ইউসুফের (আলাইহিসসালাম) ক্ষমতায়ন শুরু হয়েছিলো কুয়ায় পতন থেকে। তারপর দাস হিসেবে বিক্রি হওয়া, অপবাদ ও কারাভোগ করা এরকম বিভিন্ন ধাপ পার হতে হয়েছে। আর তা শেষ হয়েছে মিশরের ক্ষমতায় আরোহণের মধ্য দিয়ে।

জনপ্রিয়তার ফয়সালা আসমানে হয়।

অনুসারী সংখ্যা হলো ছায়ার মতো। এটিকে লম্বা হতে দেখে খুশি হওয়ার কিছু নেই, খাটো হতে দেখে দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই। আপনি তো আপনিই। আর আপনার ছায়া বড়-ছোট হয় এমন কিছু জিনিসের ভিত্তিতে (সূর্যের অবস্থান, পৃথিবীর সাথে সূর্যের কোণ ইত্যাদি), যা আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। ঠিক তেমনি আপনার অনুসারী সংখ্যা কেমন হবে সেটিও আপনার হাতে নেই, তার ফয়সালা আসমানে হয়। তাই অনুসারীর চিন্তা না করে আল্লাহ্র প্রতি সৎ থাকার ব্যাপারে মনোনিবেশ করুন।

বিজয় দান করার আগে আল্লাহ্ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে বান্দার গুনাহের বোঝা হালকা করে দেন।

বিপদ আর দুঃখ-দুর্দশা যখন ঘনীভূত হয়, তখনই সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ কোন বান্দাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার আগে দুনিয়াবি কষ্ট দিয়ে বান্দার গুনাহ ঝরিয়ে দেন। কারণ গুনাহের বোঝা নিয়ে কেউ উপরে উঠতে চাইলে সেই বোঝাই তাকে নিচের দিকে টেনে ধরবে। তাই আগেই আল্লাহ্ তার বোঝা হালকা করে দেন।

হৃদ্যতা বাড়ানোর নিয়্যাতে কারো জন্য দু'আ করার কথা তাঁকে জানানো।

একতা-ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য যদি আপনি কাউকে জানান যে, আপনি তার জন্য দু'আ করেন, তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই।

"(ইবরাহীম) বললো, 'আপনার প্রতি সালাম। আপনি আপনার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবো। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।'"

(সূরাহ মারইয়াম ১৯:৪৭)

তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া এবং সম্পদ বৃদ্ধির আশায়ও ইস্তিগফার করা যাবে।

গুনাহ্ মাফ পাওয়ার পাশাপাশি তাড়াতাড়ি বিয়ে হওয়া ও সম্পদ বৃদ্ধির আশায় ইস্তিগফার করা ('আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়া) দোষের কিছু নয়। তবে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবেনা। (অর্থাৎ ১০০ বার, ৫০০ বার এরকম সংখ্যা নির্দিষ্ট করা যাবে না)

"তোমরা তোমাদের রব্বের কাছে ক্ষমা চাও, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। (তোমরা তা করলে) তিনি অজস্র ধারায় তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দেবেন।" (সূরাহ নূহ ৭১: ১০-১২)

দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়েই সত্যকে চিনতে পারা যায়।

দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যত সহজে সত্যকে চিনতে পারা যায়, বিলাসী জীবনযাপনে তা তত সহজ হয় না। আর দুঃখকষ্ট সহ্য করেও যারা আল্লাহ্‌র পথে অবিচল থাকে আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর মেহমান করে বুকে টেনে নেন।

"আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে নিশ্চয়ই আমি আমার পথে পরিচালিত করবো।" (সূরাহ আল-'আনকাবুত ২৯:৬৯)

আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় আর রহমতের আশা যারা করে, তাদের হৃদয় এক আল্লাহ্‌র পথে স্থির থাকে।

যার প্রতি ভয় ও আশা থাকে, অন্তর তার দিকেই ঝোঁকে।এক আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় আর রহমতের আশা যারা করে, তাদের হৃদয়গুলো আল্লাহ্‌র পথে স্থির থাকে। আর হাজারো দল-মত ও মানুষের প্রতি ভয় ও আশা রাখলে সারাক্ষণ এদিক ওদিক দৌড়ানো লাগে। তাদের হৃদয়গুলো কখনো স্থির হয় না।

দুঃখ ভারাক্রান্ত মনের প্রশান্তি সালাত ও আল্লাহ্‌র যিকির।

মানুষের কাছ থেকে সমালোচনা শুনতে শুনতে যখন মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, সালাত ও যিকির তখন অন্তর প্রশান্তকারী ঔষধের কাজকরে।

"আমি জানি, তারা যেসব কথাবার্তা বলে তাতে তোমার মন সংকুচিত হয়। কাজেই প্রশংসা সহকারে তুমি তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করো, আর সাজদাহকারীদের দলভুক্ত হও।" (সূরাহ আল-হিজর ১৫: ৯৭-৯৮)

ক্বলব হলো মরুভূমির বাতাসে ওলটপালট হতে থাকা পালকের মতো।

হৃদয় যদি ফিতনার বাতাসে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে তা দমকা হাওয়ায় ওলটপালট হতে থাকে। তাই হৃদয়কে ঈমান ও ইলমের দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত রাখুন। যাতে ফিতনার সময় তা আপনাকে শক্ত হয়ে জমে থাকতে সাহায্য করে। হাদীসে এসেছে, "ক্বলব হলো মরুভূমির বাতাসে ওলট পালট হতে থাকা পালকের মতো।" (ইবনু মাজাহ: ৮৮)

মু'মিন ফিতনার সময় অবিচল থাকে।

সত্যিকারের মু'মিন ফিতনা-ফাসাদের সময় অবিচল থাকে। একটি হাদীসে নবীজী ﷺ বলেন, "মু'মিনের উদাহরণ স্বর্ণের মতো। একে আঘাত করলে লাল হয়ে যায়। কিন্তু ওজনে কমে না।" (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক: ২০৮৫২, সিলসিলা সহীহাহ: ২২৮৮)

রাহমানের বান্দারা তাদের অন্তরের ক্বিবলাকে আল্লাহ্‌র দিকে নির্ধারণ করে।

সালাতের ক্বিবলার মতো মানুষের অন্তরেরও একটি ক্বিবলা থাকে। রাহমানের বান্দা তো সে-ই, যে তার অন্তরের ক্বিবলাকে আসমানে (আল্লাহ্‌র দিকে) নির্ধারণ করে।

যারা ধৈর্য ধরতে জানে না, তাদেরকে বিজয় দেওয়া হয় না।

সালাতের মাধ্যমে ধৈর্য অর্জিত হয়। আর এই ধৈর্য ও সালাতের সম্মিলিত ফলস্বরূপ আসে বিজয়। যারা ধৈর্য ধরতে জানে না, তাদেরকে বিজয় দেওয়া হয় না।

"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২: ৪৫)

"আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দাও **এবং** তাতে অবিচল থাকো।" (সূরাহ ত্বা-হা ২০:১৩২)

"এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল।" (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৩৫)

খারাপ আর ভালো কাজ করার অনুভূতি শুধু মুমিনই বুঝতে পারে।

খারাপ কাজ করলে অস্থিরতা তৈরি হয়, আর ভালো কাজ করলে প্রশান্তি অনুভূত হয়। মু'মিন ছাড়া কেউ এ অনুভূতি টের পায় না। হাদীসে আছে, "বদ আমল করে ফেললে যদি তোমার কাছে খারাপ লাগে আর নেক আমল করলে ভালো লাগে,তাহলে তুমি ঈমানদার।" (মুস্তাদরাক হাকিম: ৩৩, মুসনাদ আহমাদ: ২২২২০)

আসমানী আযাবের একটি প্রধান কারণ হলো দ্বীনের বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করা থেকে বিরত থাকা।

“আর আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করো এবং (তা ত্যাগ করার মাধ্যমে) নিজেদেরকে হাতকে ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত কোরো না।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:১৯৫)

আসমানী আযাবের একটি প্রধান কারণ হলো দ্বীনের বিভিন্ন প্রয়োজনে খরচ করা থেকে বিরত থাকা, যেমন জিহাদ।

শুদ্ধ নিয়্যাতের ফযীলত।

নিয়্যাত পরিশুদ্ধ রেখে অল্প আমল করলেও তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কোনও খারাপ কাজ না করে শুধু মনের ভেতর ঐ কাজ করার মন্দ উদ্দেশ্য লালন করলেও আল্লাহ্ তার মর্যাদা হ্রাস করে দেন। অন্যদিকে একেক বক্তার একেক রকমের নিয়্যাতের কারণে একই কথাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রভাব ফেলতে পারে। সাধারণত যার নিয়্যাত যত বিশুদ্ধ, সে শ্রোতাকে তত প্রভাবিত করতে পারে।

“তুমি যখন নিক্ষেপ করছিলে, তাতো তুমি নিক্ষেপ করোনি। বরং আল্লাহ্‌ই নিক্ষেপ করেছিলেন।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:১৭)

শুধু জান্নাত নয়, জাহান্নামে যাওয়ারও সহজ উপায় হলো জিহাদ।

জান্নাতে যাওয়ার সহজতম রাস্তা হলো জিহাদ। এই পথের পথিকের ঋণ ছাড়া অন্য সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আবার জাহান্নামে যাওয়ার সহজতম রাস্তাও জিহাদ। জাহান্নামে প্রবেশকারীদের প্রথম দিকের একজন হলো শহীদ, যে মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য জিহাদ করেছিলো। আল্লাহ্ তার সকল আমল বরবাদ করে দেবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

সাহরিতে খেজুর খাওয়া সুন্নাহ।

সাহরিতে খেজুর খাওয়া মুস্তাহাব। অনেকেই এই সুন্নাহকে অবহেলা করে আর ভাবে যে, শুধু ইফতারিতেই খেজুর খাওয়া সুন্নাহ।

রাসূল ﷺ বলেন, “মুমিনের জন্য খেজুর কতই না উত্তম সুহুর।” (আবূ দাউদ: ২৩৪৭)

আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) খিলাফাহর সময় তারাবীহ জামাতের সাথে পড়া হতো না।

আবু বকরের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) খিলাফাহর সময় তারাবীহ জামাতের সাথে পড়া হতো না। কারণ তিনি মুরতাদদের সাথে জিহাদে ব্যস্ত ছিলেন আর তারাবীহর চেয়ে জিহাদ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) এর শাসনামলে তিনি উবাই ইবনে কা’বের (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) পেছনে তারাবীহ আদায় করতে লোকদের নির্দেশ দেন। আর তিনি রমযানের দ্বিতীয়ার্ধের আগে কুনুত পড়েননি।

নফল রোযার অন্যতম হলো শাওয়ালের ছয় রোযা।

আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য নফল রোযার বিধান রেখেছেন। তার মাঝে অন্যতম হলো শাওয়ালের ছয় দিনের রোযা।

রাসূল ﷺ বলেন, “যে রমযানে রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো।” (সহীহ মুসলিম: ২৮১৫)

ফিতনার সময়ে দৃঢ়পদ থাকার একটি উপায় হলো আল্লাহ্র যিকির।

ফিতনার সময়ে এবং জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলার সময়ে দৃঢ়পদ থাকার একটি উপায় হলো আল্লাহ্র যিকির।

“হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোনও (শত্রু) দলের মুখোমুখি হও, তখন দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহ্কে বেশি বেশি স্মরণ (যিকির) করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:৪৫)

ইখলাসের বিশুদ্ধতা।

খালেসভাবে আল্লাহ্র জন্য করা আমল কম হলেও তা নাজাতের উসিলা হয়ে যায়। আর ইখলাসবিহীন (লোকদেখানো) আমল যত বেশি করা হয়, খারাপ পরিণতি ততই নিকটে আসে। জাহান্নামের আগুনে সবার আগে নিক্ষিপ্ত হবে তিনজন। একজন আলেম, একজন মুজাহিদ এবং একজন দানশীল। ইবাদাত শুধু আল্লাহ্র জন্য হওয়াটা আল্লাহ্র হক্ব। যদি সেটা লোক দেখানো হয়ে যায় তবে সেটা গোপন শির্কের অন্তর্ভুক্ত যেটাকে প্রিয় নবী দাজ্জালের ফিতনার চেয়েও বেশি ভয়াবহ বলেছেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, “গোপন শির্কের ব্যাপারে সাবধান।”

তাক্বওয়া হলো জ্ঞানের ফসল।

ইলম অর্জন করতে গিয়ে বই আর নোটখাতায় কী টুকেছেন তা না দেখে অন্তরে কী জমা করলেন তা দেখুন। যদি আপনি আল্লাহ্র সামনে বিনয়ী হন, তাহলে আপনার ইলম আপনার অন্তরে তাক্বওয়ার জন্ম দিয়েছে। কারণ তাক্বওয়া হলো জ্ঞানের ফসল।

“বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহ্কে ভয় করে।” (সূরাহ আল-ফাতির ৩৫:২৮)

যার গুনাহ বেশি, তার উচিত তাসবীহর চেয়ে ইস্তিগফার বেশি পড়া।

ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করেন। কিন্তু নিজেদের জন্য ইস্তিগফার করেন না, কারণ তাঁরা নিষ্পাপ।

“ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।” (সূরাহ আশ-শুরা ৪২:৫)

কিন্তু মানুষ ফেরেশতা নয়। সে গুনাহ করে, আল্লাহর অবাধ্য হয়। তাই যার গুনাহ বেশি, তার উচিত তাসবীহর চেয়ে ইস্তিগফার বেশি পড়া।

ইবাদাতের পরিমাণের ভিত্তিতেই কেউ দৃঢ়পদ থাকে, আর কারো পা ফসকায়।

জ্ঞান হলো জ্ঞানীর কাঁধের উপর ভারী মালামালের মতো। ইবাদাতের মাধ্যমে নিজের পা-কে যে যত মজবুত করবে, ভার বহন করা তার জন্য তত সহজ হবে। ইবাদাতের পরিমাণের ভিত্তিতেই কেউ দৃঢ়পদ থাকে, আর কারো পা ফসকায়।

দুনিয়াবি কাজ ইখলাসের সাথে করলে ইবাদাত থেকে রিয়া দূর হয়।

দুনিয়াবি কাজ ইখলাসের সাথে করলে ইবাদাত থেকে রিয়া (লোক দেখানো) দূর হয়ে যায়। কাজেই (ঘুমানোর সুন্নাতসমূহ পালনের মাধ্যমে) নিজের ঘুমকে যে ইবাদাত বানিয়ে নিয়েছে, তার সালাত রিয়া থেকে মুক্ত থাকবে।

গোপন আমলের মাধ্যমে আমাদের প্রকাশ্য আমলগুলো অহংকার ও লোক দেখানো থেকে মুক্ত হয়।

প্রকাশ্যে নেক আমল করে প্রশংসিত হলে গোপনেও সেই আমল করুন। কারণ গোপন আমলের মাধ্যমে সেটি অহংকার ও লোক দেখানো থেকে পরিশুদ্ধ হয়।

আল্লাহ্‌ যাকে ভালোবাসেন তাকে একাকী তার রবের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেন।

আল্লাহ্‌যে আপনার উপর সন্তুষ্ট তার লক্ষণ হলো ইবাদাতের জন্য একাকী সময় কাটানোর সুযোগ লাভ করা, ঠিক যেমন পাপাচারী ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য একাকী থাকার সুযোগ পায়।

মৃত ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে দুনিয়ায় ফিরে এসে দান-সাদাকাহ করার।

দান-সাদাকাহ হলো শ্রেষ্ঠতম নেক আমলসমূহের একটি। মৃত ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা করে দুনিয়ায় ফিরে এসে দান-সাদাকাহ করার জন্য।

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আরো কিছু কালের অবকাশ কেন দিলে না? তাহলে আমি দান-সাদাকাহ করতাম ও আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরাহ মুনাফিক্বুন ৬৩:১০)

জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌ যেন আমাদেরকে এই মহান আমলের সৌভাগ্য দান করেন।

তাক্বওয়ার ফলে আল্লাহ্‌র স্মরণ বৃদ্ধি পায়।

ইলমের ফলে তাক্বওয়া উৎপন্ন হয়, আর তাক্বওয়ার ফলে আল্লাহ্‌র স্মরণ বৃদ্ধি পায়। যার তাক্বওয়া নেই সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না, আর যার ইলম নেই তার তাক্বওয়া থাকে না।

"বান্দাদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করে।" (সূরাহ আল-আ'লা ৮৭:১০)

রিযিক বৃদ্ধির একটি উপায় :

রিযিক বৃদ্ধির একটি উপায় হলো নিজে সালাত আদায় করা ও পরিবারকেও তা করার নির্দেশ দেওয়া।

“আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং তার উপর অবিচল থাকো। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না, আমিই তোমাকে রিযিক দিয়ে থাকি। আর উত্তম পরিণাম তো পরহেজগারদের জন্যই।**”** (সূরাহ্ তাহা ২০:১৩২)

আল্লাহ্র যিকির (স্মরণ) অন্তর থেকে মুনাফেকি দূর করে।

মুনাফিক্বদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন,

“তারা আল্লাহ্কে সামান্যই স্মরণ করে।” (সূরাহ্ আন-নিসা ৪:১৪২)

আর মু’মিনদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।”
(সূরাহ্ আল-আহযাব ৩৩:৪১)

আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্ত হয়।

আল্লাহ্র যিকির হলো জীবনের রূহ, রূহের জীবন, নফসের শীতলতা আর হৃদয়ের প্রশান্তি।

“নিশ্চয়ই আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয়সমূহ প্রশান্তি পায়।” (সূরাহ্ আর-রা’দ ১৩:২৮)

শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে পথভ্রষ্ট করে।

শয়তান মানুষকে বিপথে নিতে তড়িঘড়ি করে না। সে ধীরেসুস্থে কাজ করে, যাতে শিকার পালিয়ে না যায়।

“আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না।**”** (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২:২০৮)

তার পথ যেহেতু অন্ধকার, তাকে তাই ধীরেই চলতে হয়।

খারাপ কাজ ছাড়লে সবচেয়ে কঠিন দিয়ে শুরু করুন, আর ভালো কাজ করলে সবচেয়ে সহজটি দিয়ে।

খারাপ কাজ পরিত্যাগ করা শুরু করলে সবচেয়ে কঠিন খারাপ কাজটি দিয়ে শুরু করুন, কারণ এটিই সবচেয়ে ক্ষতিকর। আর ভালো কাজের অভ্যাস শুরু করলে সবচেয়ে সহজটি দিয়ে শুরু করুন, যাতে সহজে ছুটে না যায়।

জিহ্বার সংযম।

যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করে, তার একটি হলো জিহ্বা। কারণ একে অবাধে ছেড়ে দেওয়া খুবই সহজ আর এর পরিণতি খুবই কঠিন। রাসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষকে কি তাদের জিহ্বা ছাড়া আর অন্য কিছুর কারণে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়?" (তিরমিযি: ২৬১৬)

শুবহাত (সন্দেহ) দূর করার উপায় হলো নিয়মিত ইবাদাত-বন্দেগীতে রত থাকা।

নিয়মিত ইবাদাতের দ্বারা শুবহাত (সন্দেহ) দূর হয়।

"আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার (যে তাঁর ইবাদাত করে) জন্য যথেষ্ট নন?"

(সূরাহ আয-যুমার ৩৯:৩৬)

মানুষকে যা সন্তুষ্ট করে, আল্লাহ্‌কে তা অসন্তুষ্ট করবে।

সপ্ত আসমানের ওপরে আছেন আল্লাহ্, আর জমিনে আছে মানবজাতি। এক পক্ষকে যা সন্তুষ্ট করে, অপর পক্ষকে তা অসন্তুষ্ট করে।

কঠিন অন্তরকে কোমল করার জন্য আত্মিক শক্তি প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন পাপকাজ করে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে যায়।

"আর তাদের উপর এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, ফলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:১৬)

এই শক্ত অন্তরকে কোমল করার জন্য আত্মিক শক্তি প্রয়োজন।

মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে সংশোধন।

পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সংশোধন করা হলো নবীদের কর্মপদ্ধতি।

"তারপর আমি তাদের উচ্চস্বরে আহবান করেছি। আর আমি প্রকাশ্যে তাদের কাছে প্রচার করেছি এবং গোপনেও বুঝিয়েছি।" (সূরাহ নূহ ৭১:৮-৯)

সন্তানদের জন্য পিতামাতার কাছে দু'আ চাওয়া সুন্নাহ।

সন্তানদের জন্য পিতামাতার কাছে দু'আ চাওয়া সুন্নাহ, বিশেষত যদি পিতামাতা নেককার হন আর সন্তান পাপাচারী হয়।

"তারা (ইউসুফ 'আলাইহিসসালামের ভাইয়েরা) বললো, 'হে আমাদের পিতা! (আল্লাহ্‌র নিকট) আমাদের পাপের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আমরা পাপাচারী ছিলাম'।" (সূরাহ ইউসুফ ১২:৯৭)

সীমালঙ্ঘনকারী পাপী তাওবা করলে নেককার অহংকারী থেকে উত্তম হয়ে যায়।

সীমালঙ্ঘনকারী পাপী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট তাওবাহ করতে শুরু করা মাত্রই সেই নেককারের চেয়ে উত্তম হয়ে যায়, যে নেককার এতদিন আল্লাহ্‌র ইবাদাত বন্দেগীতে কাটালেও মাত্রই আল্লাহ্‌র পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে।

সম্মান আসে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার মাধ্যমে।

আল্লাহ্‌র আনুগত্য যত করবেন, আল্লাহ্‌ আপনার মর্যাদা তত বাড়াবেন। আর আল্লাহ্‌কে যতই অমান্য করবেন, তিনি আপনার লাঞ্ছনা বাড়াতে থাকবেন।

"যে কেউ সম্মান প্রত্যাশা করে, (জেনে রাখুক) যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারে। তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কথাগুলো আর সৎকাজ সেগুলোকে উচুতে তুলে ধরে।" (সূরাহ ফাতির ৩৫:১০)

বিশেষ বিশেষ সময়ে যাকাত আগে আদায় করা যায়।

এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগে যাকাত ফরয হয় না। তবে বিশেষ বিশেষ সময়ে তা আগে আগে আদায় করা উত্তম। যেমন রমযান, শা'বান, পবিত্র মাসসমূহ, মুসলিমদের বিপদ-আপদের সময়ে, যেমন দারিদ্র্য এবং জিহাদ।

আল্লাহ্‌র সাহায্যের জন্য ধৈর্য আবশ্যক।

এমনকি নবীদেরকেও দীর্ঘকাল যাবত বিপদ-আপদ সহ্য করতে হয়েছে। তাই ধৈর্যধারণ আবশ্যক।

"তাদেরকে অভাবের তীব্র তাড়না এবং বিপদ স্পর্শ করেছিলো। আর তারা এতদূর প্রকম্পিত হয়েছিলো যে নবী ও তার সঙ্গের মুমিনগণ বলেছিলো, 'কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য?' জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র সাহায্য নিকটবর্তী।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:২১৪)

নি'য়ামতের না-শোকরি করার দ্বারা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে আহ্বান করা হয়।

নি'য়ামতের না-শোকরি করার দ্বারা আল্লাহ্‌র ক্রোধকে আহ্বান করা হয়। আর অপরাধ ছড়িয়ে পড়ার কারণও এটিই।

"অতএব, আল্লাহ্‌র নি'য়ামতসমূহ স্মরণ করো আর জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না।" (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:৭৪)

জুমু'আর দিনে সূর্যাস্তের আগে আল্লাহ্ দু'আ কবুল করেন।

হাদীসে আছে "জুমু'আর দিনে এমন একটি সময় আছে যখন কোনো মুসলিম যে কোনও ভালো দু'আই করবে, তা-ই আল্লাহ্ তাকে দান করবেন।" সবচেয়ে সঠিক মত হলো এই সময়টি সূর্যাস্তের আগে। ইবনে আব্বাস, আবু হুরায়রা ও তাউসের এটাই মত।

জুমু'আর দিনের গোসল হলো সর্বোত্তম গোসল।

জুমু'আর দিনের গোসল সর্বোত্তম গোসল। এর সময় শুরু হয় ভোর (ফজর) থেকে। যাদের উপর জুমু'আর সালাত ফরয, তাদের উপর এ হুকুম বেশি জোরালো। নারী বা মুসাফিরের ওপর নয়। হাদীসে আছে,"যে জুমু'আর সালাত আদায় করতে চায়,সে যেন গোসল করে।" (সহীহ বুখারী: ৮৩৭, সহীহ মুসলিম: ৮৪৪)

যারা তাওবা-ইস্তিগফারে সময় কাটায় তারাই আল্লাহ্‌র সবচেয়ে নিকটবর্তী।

আল্লাহ্‌র রহমতের সবচেয়ে নিকটবর্তী হলো যারা তাওবাহ-ইস্তিগফারে সময় কাটায়।

"তোমরা কেন আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো না, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও?" (সূরাহ আন-নামল ২৭:৪৬)

দু'আর মাধ্যমে বিপদ-আপদ দূরকরুন।

রাসূল ﷺ ছিলেন বিপদে-আপদে সবচেয়ে ধৈর্যশীল। অথচ তিনিও আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চেয়ে দু'আ করতেন। অতএব, দু'আর মাধ্যমে বিপদ-আপদ দূর করুন, আর বিপদ **এলে**ও হক্কের ওপর অটল থাকুন।

খাহেশাতকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সালাতের মাধ্যমে।

যারা বেশি বেশি সালাত পড়ে, তারা খাহেশাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেশি সক্ষম। খাহেশাত প্রবল হয় সালাতকে অবহেলা করলে।

"তাদের পর এলো অপদার্থ পরবর্তীরা, তারা সালাত হারালো, আর লালসার বশবর্তী হলো।" (সূরাহ মারইয়াম ১৯:৫৯)

মানুষের গুনাহ বা অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তার অন্তর তালাবদ্ধ করে দেন।

কুরআন পড়ে অনুধাবন করতে হয়, চিন্তা ফিকির করতে হয়। কিন্তু মানুষের গুনাহ বা অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তার অন্তর তালাবদ্ধ করে দেন। ফলে সে আর চিন্তা ফিকির করতে পারে না।

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তরে তালা দেওয়া আছে?" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২৪)

আল্লাহ্র সাথে সত্যবাদী না হলে কেউই সত্য থেকে উপকৃত হতে পারে না।

বাইরে সবাই-ই সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু মানুষের হৃদয় যদি আল্লাহ্র সাথে সত্যবাদী না হয় তাহলে কেউই সত্য থেকে উপকৃত হতে পারে না। যদিও সে সত্যের পথে থাকে।

"তারা যদি আল্লাহ্র সাথে সত্যবাদী হতো (আল্লাহ্র কাছে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করতো), তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো।" (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২১)

দুনিয়া নিয়ে আশা যত বড়, আখিরাত নিয়ে তার জ্ঞান তত কম।

দুনিয়া নিয়ে যার আশা যত বড়, আখিরাত নিয়ে তার জ্ঞান তত কম। আখিরাতের বিশালত্ব, পুরস্কার, শাস্তির ব্যাপ্তি এসব যদি তারা জানতো তবে দুনিয়া নিয়ে তাদের আশা কখনো বড় হতে পারতো না। কিন্তু যেদিন তারা সত্যটা জানবে, সেদিন আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না।

"ছেড়ে দাও ওদেরকে, ওরা খেতে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর (মিথ্যে) আশা ওদেরকে উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (ওদের কাজের পরিণতি) জানতে পারবে।" (সূরাহ আল-হিজর ১৫:৩)

একাকী অবস্থায় আপনার চরিত্রই আপনার আসল রূপ।

একাকী থাকা অবস্থায় আপনার কাজকর্ম যেমন, আল্লাহ্‌র নিকট আপনার সত্যিকার মর্যাদাও তেমন।

হক্ক কথা বলার উপকারিতা।

হক্ক কথা বলার কারণে নেক আমল করা সহজ হয় এবং গুনাহ্ মাফ হয়।

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সরল সঠিক কথা বলো। তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলো ত্রুটি মুক্ত করে দিবেন আর তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরাহ্ আল-আহ্‌যাব ৩৩:৭০-৭১)

নিজের গুনাহের মত নিজের নেক আমলগুলোকেও গোপন রাখুন।

সর্বোচ্চ সতর্কতা হলো নিজের গুনাহ্ গোপন রাখার মতো করে নিজের (নফল) আমলগুলোও গোপন রাখা।

আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে না থাকলে আপনি কখনোই আল্লাহ্‌র সাথে সৎ হতে পারবেন না।

কোন কিছু লেখা বা বলার সময় অন্তরকে আল্লাহ্ ছাড়া আর সবার ভয় থেকে মুক্ত করতে না পারলে আপনি কখনোই হক কথা বলতে পারবেন না। ভেবে দেখুন কত জনের চিন্তা আপনার মাথায় এসে মনোযোগ নষ্ট করে দেয়,এক সময় সেই কাজ কে শুধু আল্লাহ্‌র জন্য করা থেকে বিরত রাখে।

যুলক্বদাহ্, যুলহিজ্জা, মুহাররম ও রজব মাসে কৃত গুনাহ্ অন্য মাসে কৃত গুনাহের চেয়ে গুরুতর।

সম্মানিত মাস হলো যুলক্বদাহ্, যুলহিজ্জা, মুহাররম ও রজব। এসকল মাসে কৃত গুনাহ্ অন্য মাসে কৃত গুনাহের চেয়ে গুরুতর। আর এসকল মাসের ইবাদাত অন্য মাসের ইবাদাতের চেয়ে বেশি সাওয়াবের।

"কাজেই ওই সময়ের মধ্যে নিজেদের উপর যুলুম কোরো না।" (সূরাহ্ আত-তাওবাহ্ ৯:৩৬)

তবে গুনাহের তুলনায় ইবাদাতের সাওয়াব বৃদ্ধির অনুপাত বেশি।

যুলহিজ্জা মাসের ফযিলত।

যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিন বৎসরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন আর রমযানের শেষ দশ রাত্রি হলো সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি। তাই যে কেউ এই দিন আর রাতগুলোতে ইবাদাত করতে পারলো, সে সত্যিই ভাগ্যবান।

আল্লাহ্ মূসার (আলাইহিসসালাম) সাথে কথা বলেছিলেন যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে। এই দিনগুলোর মধ্যেই ওয়াহী নাযিল সমাপ্ত হয়ে দ্বীন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়। আর আল্লাহ্ এই দিনগুলোর নামে শপথ করেছেন। এই দিনগুলোতে করা নেক আমল অন্যান্য দিনের চেয়ে উত্তম। বিশেষ করে তাকবীর এবং সওম। আর বৎসরের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে আরাফাহ্র দিন।

রমযানের ছুটে যাওয়া সওমগুলো কাযা করার জন্য যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনই উত্তম। আশা করা যায় যে, এই সওমের মাধ্যমে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেবার সাথে সাথে যুলহিজ্জার দশ দিন নফল সওম রাখার সওয়াবও পাওয়া যাবে। 'উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) বলেন, "রমযানের না রাখতে পারা সওম পূরণ করে নেওয়ার জন্য আমার কাছে এই দশ দিনের থেকে পছন্দনীয় আর কোনো দিন নেই।"

রমযানের পর সওম পালনের জন্য সবথেকে উত্তম দিন হচ্ছে আরাফাহ্র দিন। এক দিনেই আল্লাহ্ দুই বছরের গুনাহ মুছে দেন। যারা হাজী নন, এই সময়ে তাঁদের জন্য সবথেকে উত্তম আমল হচ্ছে সওম পালন, তাকবীর দেওয়া, দু'আ করা এবং বিশেষ করে ইস্তিগফার করা।

যারা হাজ্জ করছেন বা করছেন না, সবার জন্যেই আরাফাহ্র দিনে সওম পালন সাওয়াবের। তবে এই সওমের ফযিলত হচ্ছে দুই বছরের গুনাহ মাফ হওয়া, যেখানে আরাফাহ্র ময়দানে অবস্থান করার ফযিলত হচ্ছে আজীবনের গুনাহ মাফ। তাই সালাত পড়া ও দু'আ করতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকলে হাজীগণের এই দিন সওম পালন করা উচিত নয়।

তাকবীর তাশরিক শুরু হয় আরাফাহ্র দিন ফজর সালাতের পর থেকে। আইয়ামে তাশরিকের শেষ দিনে (যুলহিজ্জা মাসের ১৩ তারিখ) আসর সালাতের পর এসে তা শেষ হয়। তাকবীরের একাধিক সহীহ পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার কাবীরা।"

আরাফার দিনের দু'আ শ্রেষ্ঠ আমলের মধ্যে অন্যতম আর তাই এ সময়ে দু'আ কবুল হবার সম্ভাবনাও বেশি।

জান্নাত সবথেকে বেশি কাছে আসে আর জাহান্নাম সবথেকে বেশি দূরে যায় আরাফাহ্র দিনে। নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য যে এই সময়ে একটি আমলও খুঁজে পায় না সে বড় দুর্ভাগা। রাসূল ﷺ বলেন, "আরাফাহ্র দিনে আল্লাহ্ যতজনকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, এত বেশি আর কোনও দিনেই করেন না।"

ফযিলতপূর্ণ দিনগুলোতে আল্লাহ্ আমল করা সহজ করে দেন।

বিশেষ ফযিলতময় দিনগুলোতে আল্লাহ্ সবচেয়ে সহজ আমলটিকেই সবচেয়ে বেশি ফযিলতপূর্ণ করে দেন, আর তা হলো আল্লাহ্র যিকির। যাতে করে অবহেলাকারী ব্যক্তিরাও সাওয়াব পেয়ে যায় আর অভাগারা ছাড়া কেউই বঞ্চিত না হয়।

হাজ্জের সময় একটু ভুলে যাওয়া সুন্নাহ।

যারা হাজ্জ করেন না, তাদের পক্ষ থেকে মক্কায় কুরবানির দিন জবেহ করার জন্য হাজীদের কাছে হাদী (কুরবানির পশু) পাঠানো এবং সেই সাথে হাজীদের জন্যও হাদী দিয়ে দেওয়াটা একটি ভুলে যাওয়া সুন্নাহ। এর ফলে হাজ্জ না করা ওই ব্যক্তির কুরবানি আদায় হয়ে যায়। চুল-নখ কাটা থেকেও তাকে বিরত থাকতে হয় না।

আল্লাহ্র নিকট গোপন দু'আ।

গোপনে দু'আ করাকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন।কারণ, তারাই কেবল গোপনে দু'আ করে যারা আল্লাহ্র নৈকট্যের ব্যাপারে আস্থাশীল।
"তোমার প্রতিপালককে ডাকো বিনয়ের সাথে ও নিভৃতে।"

(সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:৫৫)

মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করা আল্লাহ্র অধিকার লঙ্ঘন করার চেয়েও গুরুতর।

মানুষের একটি অধিকার লঙ্ঘন করা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তরটি অধিকার লঙ্ঘন করার থেকেও গুরুতর। কেননা, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করতেও পারেন, কিন্তু মানুষেরা সেদিন ঠিকই আপনার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

সবরের মাধ্যমেই বিজয় আসে।

বিজয় ততক্ষণ পর্যন্ত আসেনা যতক্ষণ না তা সবরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছায়। যাদের ধৈর্য সব থেকে বেশি, তারাই সব থেকে অধিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। রাসূল ﷺ বলেন, "জেনে রাখো, সবরের মাধ্যমেই বিজয় আসে।"

(মুস্তাদরাক হাকিম: ৬৩০৪, তাবারানী কাবীর: ১১২৪৩)

মাজলুমকে দান-সদকা দিয়ে সাহায্য করুন।

দান-সদকা মাজলুমদেরকে জালিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করে, তার অনিষ্টকে দূরীভূত করে ও তার অত্যাচার ও জুলুমের প্রভাবকে কমিয়ে আনে।

"তোমরা যে ব্যয়ই করো কিংবা যে কোনও মানত করো, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তা জানেন কিন্তু জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

(সূরাহ আল-বাকারাহ ২:২৭০)

দুর্বল ঈমানের লক্ষণ।

দুর্বল ঈমানের একটি লক্ষণ হলো নিজের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে অন্যের দোষ দেখে খুশি হওয়া। আর মজবুত ঈমানের লক্ষণ হলো নিজের মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকার পরও অন্যের মাঝে সেই ত্রুটি দেখে দুঃখিত হওয়া।

মুহাররম মাসের রোজা।

তাহাজ্জুদ যেমন সব নফল সালাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মুহাররমের সওম সব নফল সওমের মাঝে শ্রেষ্ঠ। হাদীসে আছে, রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সওম হলো মুহাররমের সওম। আর ফরয সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের সালাত।

রোগাক্রান্ত অন্তর কুরআন থেকে হিদায়াত পায় না।

কুরআন হলো আলো। এ থেকে যে হিদায়াত পায় না, তার অন্তরই রোগাক্রান্ত। ঠিক যেমন চোখ বন্ধ করে থাকা ব্যক্তি সূর্যের আলো থেকে উপকৃত হয় না।

"আর আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"

(সূরাহ আন-নিসা ৪:১৭৪)

সকাল সন্ধ্যার যিকিরের উপকারিতা।

যারা সকাল-সন্ধ্যার যিকির গুলো নিয়মিত করে, তারা কুরআনে উল্লেখিত উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পায়।

"তোমার প্রতি পালককে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ করো আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।"

(সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

নফসের পরিশুদ্ধি।

অন্তরের পরিশুদ্ধির আগে নফসের পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। কারণ নফস যদি অন্তরে খাহেশাত প্রবেশ না করায়, তাহলে অন্তর নিরপেক্ষই থাকে।এজন্য আল্লাহ্ প্রায়শ অন্তরের প্রশংসা আর নফসের নিন্দা করেছেন।

নি'য়ামাত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারাটাও একটা নি'য়ামাত।

আল্লাহ্‌র নি'য়ামাত গুণে শেষ করা যায় না। এমনকি নি'য়ামাত পেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে পারাটাও একটা নি'য়ামাত, যেটার জন্য আবার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আমাকে শক্তি দানক রুন।"

(সূরাহ আন-নাম্‌ল ২৭:১৯)

তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে ঘুমিয়ে উঠতে না পারলেও সাওয়াব আছে।

ভালো কাজ করার নিয়্যাত করলেই সে কাজ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, "তাহাজ্জুদের জন্য জাগার নিয়্যাত করে ঘুমিয়েও বান্দা যদি ঘুম থেকে উঠতে না পারে, তাহলে সেই ঘুম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য **সা**দকাহ। আর তার তাহাজ্জুদের সাওয়াবও লেখা হয়ে গেছে।"

(ইবনু মাজাহ: ১৩৪৪, সুনানুল বাইহাকি: ৪৪৯৯, সুনানুন নাসায়ি: ১৭৮৪)

শীতকালের রোযা হলো গনিমত।

আখিরাতের ব্যবসা দুনিয়ার ব্যবসার মতোই। এরও এমন মৌসুম আছে যখন অল্প পরিশ্রমে অধিক লাভবান হওয়া যায়। সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "শীতকালের রোযা হলো গনিমত।"

(তিরমিযী: ৭৯৭)

গুনাহ করলে নেক আমল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

গুনাহের কারণে নেক আমলের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। গুনাহ যত বড় হয়, তত বড় নেক আমলের সুযোগও হাতছাড়া হয়।

জুমু'আর দিনে দরূদ পড়া।

জুমু'আর দিনের সবচেয়ে উত্তম নেক আমলগুলোর একটি হলো রাসূলের ﷺ উপর দরূদ পড়া। কারণ জুমু'আর দিন সব দিনের মাঝে শ্রেষ্ঠ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ সব নবী-রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এসব দিনের বিশেষ কোন ফযিলত নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেদিন জন্ম নেন, তা এক মহান দিন। আর যেদিন তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, তা আরো মহান। কারণ এই দিনে আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে ওয়াহী নাযিল

হয়ে মুহাম্মাদকে ﷺ নবুওয়াত দানে ধন্য করা হয়। অথচ তিনি এ দুটি দিনের কোনওটিকেই নির্দিষ্ট করে বলে যাননি। কারণ এগুলোর বিশেষ কোনো ফযিলত নেই।

পাপের কারণে রিযিক কমে যায়।

মানুষকে তার গুনাহের কারণে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়।

"ইয়াহুদীদের পাপাচারের কারণে আমি তাদের জন্য কতিপয় খাদ্য হারাম করে দিয়েছিলাম যা আগে তাদের জন্য হালাল ছিলো।" (সূরাহ আন-নিসা ৪:১৬০)

সোহবতের কারণে মানুষ বিনয়ী কিংবা অহংকারী হয়।

সমাজের হর্তা-কর্তাদের সাথে মেলামেশা করলে অহংকার বাড়ে। আর দুর্বলদের সাথে মেলামেশা করলে বিনয় আসে। হাদীসে আছে, রাসূল ﷺ দুর্বলদের কাছে যেতেন, তাদের অসুস্থদের দেখতে যেতেন আর তাদের জানাযায় শরিক হতেন।

দুর্যোগের সময় দু'আ কবুল করাতে চাইলে।

প্রাচুর্যের সময় দু'আ করা অব্যাহত রাখলে দুর্যোগের সময় করা দু'আ কবুল হয়। হাদীসে আছে, "যে আশা করে দুঃখ-দুর্দশার সময় আল্লাহ্ তার দু'আ কবুল করুক, সে যেন স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে দু'আ করে।"

তাওবার প্রথম ধাপ।

তাওবাহ কবুল হওয়ার প্রথম ধাপ হলো আল্লাহ্‌র কাছে নিজের পাপ স্বীকার করা। রাসূল ﷺ বলেন, "বান্দা যখন গুনাহ স্বীকার করে ও তাওবাহ করে, আল্লাহ্ তার তাওবাহ কবুল করেন।" (সহীহ বুখারী: ২৫১৮, সহীহ মুসলিম: ৭০৩৬)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

আল্লাহর জমিনে নবী রাসূলদের দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছিলো সৎ কাজের আদেশ এবং যাবতীয় অসৎ কাজের নিষেধ। এই কাজের কারণেই সমাজে শৃঙ্খলা বিরাজ করে, আর এর ব্যত্যয় ঘটলে আল্লাহ্ পুরো জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেন। এমনকি মানুষের দু'আ পর্যন্ত কবুল করা হয় না, যদি সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ করার মত কেউ না থাকে। আর এই কাজে সবচেয়ে বড় ভূমিকা থাকে উম্মাহর আলেমদের। আলেমরা মানহাজ যদি এর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে উম্মাহ বিপথে পরিচালিত হয়, যেমনটা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই অধ্যায়টি তাই দ্বীনের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে। শাইখ এখানে আলেমদের করণীয়, দাওয়াতের পদ্ধতি, সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের প্রয়োজনীয়তা এমন সব জরুরী বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী না থাকার কারণে কোন জাতির উপর গযব তরান্বিত হয়।

কোনো জাতির মাঝে বিদ্যমান পাপাচারগুলোর কারণে সে জাতির উপর আসমানী গযব নাযিল হয় না। কারণ কোনো জাতিই পুরোপুরি পাপাচারমুক্ত নয়। গযব নাযিল হয় বরং কোনো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী না থাকার কারণে। গযব আরও তরান্বিত হয় যখন সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধকারীদের বিরুদ্ধে উল্টো লড়াই করা হয়।

নবী রাসূলগণের দাওয়াত ছিলো এমন সব হারাম কাজের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো।

লোকে প্রথমে তা প্রত্যাখ্যান করলেও পরে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে—এমন সব কথা বলে তারা একটা হারামকে হালাল প্রমাণ করতে চায়। অথচ নবী-রাসূলগণ এমন কতগুলো জিনিসের বিরুদ্ধেই দাওয়াত দিয়েছেন যেগুলোতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। যেমন, শির্ক, সমকামিতা, ব্যভিচার, সুদ ইত্যাদি।

যদি কেউ অন্যায় অবিচারের গতি রোধ না করে তাহলে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে।

অন্যায়-অবিচারের উদাহরণ একটি চাকার মত, কেউ না কেউ সেটা ধাক্কা দিয়ে সামনে আগায় আর অন্য কেউ তার গতিরোধ করে। এর গতিরোধ করার যখন কেউ থাকে না, তখন এই চাকা চলতেই থাকে। এরকম হলে সবাইকেই গণহারে শাস্তি পেতে হবে।

“আর যদি আল্লাহ্ মানবজাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেতো, কিন্তু আল্লাহ সর্বজগতের প্রতি কৃপাশীল।”

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২:২৫১)

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হারাম অর্থ হলো সত্যকে গোপন করার বিনিময়ে আলেমের নেওয়া ঘুষ।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট হারাম অর্থ হলো সত্যকে গোপন করার বিনিময়ে আলেম কর্তৃক গৃহীত ঘুষ। এটি সুদের চেয়েও খারাপ। কারণ সুদ গ্রহণ করা ব্যক্তিগত পাপ, আর সত্যকে গোপন করা সমষ্টিগত পাপ।

“তারা বেশি বেশি মিথ্যা শুনতে আগ্রহী, হারাম ভক্ষণকারী।”

(সূরাহ্ আল-মা’ইদাহ্ ৫:৪২)

তারগীব এবং তারহীব উভয় দাওয়াই জরুরি।

কোনো দা’ঈর নিজেকে কেবল তারগীবের (নেক আমলের উৎসাহ প্রদান) মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলা এবং তারহীব (গুনাহ থেকে সতর্ক করা) পরিহার করা সকল রাসূলের দা’ওয়াহ পদ্ধতির সাথে সাংঘর্ষিক।

“(হে মুহাম্মাদ) আপনাকে তা-ই বলা হচ্ছে যা পূর্বের রাসূলগণকে বলা হয়েছিলো। নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক ক্ষমার অধিকারী, আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা।” (সূরাহ ফুসসিলাত ৪১:৪৩)

মাজলুমকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচুন।

যে একজন মু’মিনের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তাহলে সিরিয়ার মতো পুরো একটি জাতির লোকেদের দ্বীন, রক্ত, ইজ্জত, সম্পদ আর নিরাপত্তা যেখানে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কতটা গুরুতর? মাযলুমকে সাহায্য করার মাধ্যমে আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচুন।

আর মাযলুমকে সাহায্য করা কোন জাতির জন্য বিরাট পরীক্ষা। এর ফলাফল হলো হয় সে জাতি টিকে থাকবে নয়তো আল্লাহ অন্য জাতি দিয়ে সেটাকে প্রতিস্থাপিত করে দেবেন।

“তোমরা যদি বের না হও, তিনি (আল্লাহ) তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনা হবে, (অথচ) তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৩৯)

খুতবার মিম্বরগুলো শুধু ওয়াজ-নসীহতের জায়গা নয়!

খুতবার মিম্বরগুলো কেবল ওয়াজ-নসিহতের জায়গা নয়। এখানে উম্মাহর সমসাময়িক প্রয়োজনীয় বিষয়াদিও আলোচনা করতে হয়। সহীহ বুখারিতে আছে নবীজী ﷺ মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ ও শত্রুভাবাপন্ন বিভিন্ন গোত্র (যেমন আসলাম, গাফফার, উসইয়াহ) সম্পর্কে মিম্বার থেকে আলোচনা করতেন।

অর্থ হৃদয়কে কলুষিত করে।

নবীদের কেউই আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের জন্য অর্থ গ্রহণ করেননি। কেননা অর্থ হৃদয়কে কলুষিত করে, যার ফলে দ্বীনের দাওয়াও সেই অনুপাতে কলুষিত হয়ে যায়।

“ওরা হলো তারা যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছিলেন, তুমি তাদের পথ অনুসরণ করো; বলো, এর জন্য (বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য) আমি কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটা সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ বাণী।” (সূরাহ আল-আন’আম ৬:৯০)

মন্দ কাজের নিষেধ হতে হবে সেই কাজের ভয়াবহতার সমানুপাতে।

মন্দ কাজের নিষেধ হতে হবে সেই কাজের ভয়াবহতার সমানুপাতে। কোনো অখ্যাত গুনাহের কাজ নিয়ে বেশি উচ্চবাচ্য করে সেটিকে বিখ্যাত করে দিবেন না। আপনার কাছে মনে হবে আপনি খারাপ কাজের বিরোধিতা করে সাওয়াব পাচ্ছেন। অথচ আপনার কারণে সেটি আরও প্রচার পাচ্ছে, আর আপনি প্রচার করার গুনাহ পাচ্ছেন।

ইলমের যাকাত।

সম্পদের যাকাত যেমন সেটা খরচ করা, ইলমের যাকাত হলো তা প্রচার করা।

"হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আপনি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেন না।" (সূরাহ আল-মা'ইদাহ ৫:৬৭)

আলেমের উদাহরণ হলো তারার মতো।

নবীজী ﷺ আলেমদেরকে আকাশের তারার সাথে তুলনা করেছেন। কারণ, তাঁদের কাজ হলো কাছের ও দূরের সকলকে পথ দেখানো। গাছ বা পাথরের মতো শুধু নিকটবর্তীদেরকে পথ দেখানো না।

হাজীদের খরচ বৃদ্ধি করে হজ্জকে কঠিন করে দেওয়া আল্লাহর পথ এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের মতই গুনাহ।

অনেক জায়গায় হাজীদের খরচ আসল পরিমাণের চেয়ে এত বাড়িয়ে ধরা হয় যে, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে ভ্রমণে যাওয়াও হজ্জব্রত পালনের চেয়ে সহজ হয়ে যায়। এভাবে মানুষকে হজ্জ-বিমুখ করাটা আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান এবং মাসজিদুল হারামে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের গুনাহ হিসেবে গণ্য হবে।

(সূরাহ আল-বাক্বারাহর ২১৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য)।

সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য নিজে একেবারে নিষ্পাপ হওয়াটা জরুরি না।

সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধ করার জন্য নিজে একেবারে নিষ্পাপ হওয়াটা জরুরি না। হাদীসে আছে,

"সৎ কাজের আদেশ করো, যদিও তুমি তা পুরোপুরি না পালন করে থাকো। অসৎ কাজের নিষেধ করো, যদিও তুমি তা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে না পারো।"

(মু'জামুল আওসাত: ৬৬২৮)

মন্দ কাজ দেখে বাধা না দিলে তা সমাজে ছড়িয়ে পড়বে।

মন্দ কাজ দেখতে পেয়েও যদি বাধা দেওয়া না হয়, তাহলে আরেকজন এর দেখাদেখি সেই কাজ করবে। এভাবেই সেটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও মন্দ কাজের নিষেধ করলেই তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে এমন না, কিন্তু এর অনুসারীর সংখ্যা অবশ্যই কমে।

জালিমের সাথে জালিমের সহচররাও রেহাই পাবে না।

"আমি তো কেবল হুকুমের গোলাম" কথাটা জালিমের সহচররা ব্যবহার করে। এসব অজুহাত তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ সবার আগে সে আল্লাহর গোলাম। ফির'আউন তার সৈন্যদের হুকুম করেছিলো আর তারা তা মান্য করেছিলো। আর আল্লাহ্ ফেরাউনের সাথে তার এই আজ্ঞাবহ বাহিনীকেও সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন।

"অতএব, আমি তাকে ও তার সৈন্যদলকে সাগরে নিক্ষেপ করলাম।"

(সূরাহ্ আয-যারিয়াত ৫১:৪০)

জিহাদ আর সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী ছাড়া কোন জাতিই টিকতে পারবে না।

উম্মাহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ জিহাদের বিধান দিয়েছেন। আর ভেতরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের বিধান দিয়েছেন। এ দুটি জিনিস ছাড়া কোনো জাতিই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর যদি হয়েও যায়, তাহলে বেশিদিন টিকতে পারে না।

জুলুমের প্রতি সামর্থ্যবানের নীরবতা হলো মাজলুমকে পরিত্যাগ করার একটি রূপ।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে যুলুমকে প্রতিরোধ করে না, সে ওই যালিমের সহযোগী। হাদীসে এসেছে,

"একজন মুসলিমকে যে পরিত্যাগ করে, আল্লাহ্ তাকে পরিত্যাগ করেন।"

(আবু দাউদ: ৪৮৮৬, শুয়াবুল ইমান: ৭১১৫)

আলেমের দায়িত্বে অবহেলার পরিণতি।

আলেম যদি তাঁর দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত থাকেন, অজ্ঞ লোক সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এর ফলে সমাজে ভুল-ভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অজ্ঞ ব্যক্তিকে তার ভ্রান্তির জন্য দোষারোপ করার আগে আলেমকে তাঁর দায়িত্বে অবহেলার জন্য তিরস্কার করা উচিত।

শরি’আহ মানে শুধু শাস্তি প্রয়োগ নয়।

শুধু হুদুদ কায়েমের (শাস্তি প্রয়োগ) মধ্যে শরি’আহকে সীমাবদ্ধ করা ভুল। এটি আরো বিস্তৃত বিষয় যাতে রয়েছে হারামের নিষেধ করা, হালালকে বৈধ করা, জনগণের সম্পদ ও অধিকারের রক্ষণাবেক্ষণ করা।

“আর আমি তাদের (রাসূলগণের) সাথে প্রেরণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড (ন্যায়) যাতে মানুষ সুবিচার কায়েম করে।” (সূরাহ হাদীদ ৫৭:২৫)

উম্মাহর কল্যাণ নির্ভর করে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে।

উম্মাহর মাঝে কতটুকু খায়ের আছে তা পরিমাপ করার মানদণ্ড হচ্ছে তার মধ্যে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের উপস্থিতি দেখা। যদি তাদের সংখ্যা হ্রাস পায় সেই অনুপাতে উম্মাহর মধ্য থেকে খায়েরও উঠে যায়।

“তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে,তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করো।” (সূরাহ আলি ‘ইমরান ৩:১১০)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের (মুসলিহ) দ্বারাই আল্লাহ উম্মাহকে রক্ষা করেন, সাধারণ নেককারদের (সালিহ) দ্বারা নয়। আল্লাহ বলেন,

“তোমার প্রতিপালক এমন নন যে তিনি অন্যায়ভাবে কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন এমন অবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।’’

(সূরাহ হুদ ১১:১১৭)

মুনাফিক এবং ইহুদী খ্রিস্টানরা নবীজীকে ঘৃণা করতো, কারণ তিনি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতেন।

নবীজীর ﷺ যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে এসেছে, তার সর্বপ্রথমটি হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ।

“যারা প্রেরিত উম্মী নবীকে অনুসরণ করবে যা তাদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের) কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে তারা লিখিত পাবে। সে তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে।” (সূরাহ আল-আ’রাফ ৭:১৫৭)

একারণেই মুনাফিকদের পাশাপাশি ইহুদী খ্রিষ্টানরাও নবীজীকে ঘৃণা করতো।

দাওয়াতের প্রান্তিকতা।

শুধুমাত্র শাসকের অধিকার বিষয়ক আয়াত ও হাদীস প্রচার করার মাধ্যমে যালিম ও স্বৈরাচারের উদ্ভব হয়।আর শুধুমাত্র শাসিতের অধিকার সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস প্রচার করলে বিদ্রোহী ও খারেজিদের উদ্ভব হয়। দাওয়াতের এই দু'টি প্রান্তিক অবস্থানের ফলে ন্যায় হারিয়ে যায়।

কুফরের বিপরীতে ইসলামের ফিতরাতের দিকে আহবান।

পশ্চিমা বিশ্ব যেভাবে মুসলিমদেরকে বিকৃতি ও কুফরের দিকে ডাকে, তাদেরকে সেভাবে ইসলামের ফিতরাতের দিকে ডাকার মতো একজন শাসক আজ উম্মাহর মাঝে নেই।

বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয়।

উম্মাহর সবচেয়ে লজ্জাজনক বিষয়গুলোর একটি হলো, এর শত্রুরা তো এর উপর নির্যাতন করছেই, তার উপর এই ধ্যান ধারণা ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, উম্মাহর এই দুর্দশার জন্য এর লোকেরাই দায়ী। আবার আমাদেরকে তারা এই সংকট থেকে উত্তরণের ছবকও দিচ্ছে। তাই উম্মাহ তার এই শত্রুদেরকে শিক্ষকের মত সম্মান করা শুরু করছে, মিথ্যাবাদী যালিম হিসেবে ঘৃণা করছে না।

যালিমের বিরুদ্ধে ক্রোধেরও একটা সীমা আছে।

যালিমের যুলুমের ফলে তার প্রতি উৎসারিত ক্রোধ যেন আপনাকে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত না করে। প্রতিশোধ নেওয়ার মাঝে এমনই এক মজা আছে যা সীমা অতিক্রম করতে উৎসাহিত করে।

যারা অশ্লীলতা ছড়িয়ে বেড়ায় তাদের পরিণাম বড় ভয়াবহ।

"নিশ্চই যারা পছন্দ করে যে মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা প্রসার পাক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরাহ আন-নূর ২৪:১৯)

এই হলো যে অশ্লীলতার প্রসার 'পছন্দ' করে, তার পরিণাম। তাহলে যে সত্যি সত্যিই তা ছড়িয়ে বেড়ায়, তার পরিণাম কেমন হবে?

নগ্নতা আর অশ্লীলতার বিরুদ্ধে লড়াই মনুষ্যত্বের দাবি।

দারিদ্র্য ও খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে যেমন লড়াই করতে হয়, নগ্নতা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধেও সেভাবেই লড়াই করতে হয়।

"নিশ্চয়ই তোমার জন্য (এত অধিক পরিমাণ) দেওয়া হলো যে, সেখানে (জান্নাতে) তোমরা ক্ষুধার্তও হবে না, নগ্নও হবে না।" (সূরাহ তাহা ২০:১১৮)

ক্ষুধার বিরুদ্ধে জন্তু-জানোয়াররাও লড়াই করে। তাদের থেকে মানুষ আলাদা হয় নগ্নতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধ্যমে।

গিবত হলো কবীরা গুনাহ।

গিবত হলো কবীরা গুনাহ। যার ব্যাপারে গিবত করেছেন সে যদি তা জেনে ফেলে, তাহলে এর কাফফারা হলো যার কাছে গিবত করেছেন তার কাছে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে ভালো কথা বলা। আর যদি সে এ ব্যাপারে জানতে না পারে, তাহলে কাফফারা হলো ইস্তিগফার করা ও তার ব্যাপারে ভালো কথা বলা।

দ্বীনের বার্তা সহজসরলভাবে পৌঁছানো।

দাঈ ইলাল্লাহর উচিত সহজ সরলভাবে বার্তা পৌঁছানো। যাদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে হবে তাদের যত নিকটবর্তী হওয়া যাবে ততই বার্তার কার্যকারিতা বাড়বে। আল্লাহর রাসূল ﷺ মানুষের মাঝে খুব সহজেই মিশে যেতেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ﷺ ব্যাপারে বলেন,

“তোমরা যা খাও তিনিও তা খান, আর তোমরা যা পান করো তিনিও তা পান করেন।” (সূরাহ আল-মু’মিনুন ২৩:৩৩)

সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধকারীকে আল্লাহ বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন।

যারা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর কাতারে শামিল হয় আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা করেন। তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে সেটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পরীক্ষা। আর পাপাচারীর উপর বিপদ আপতিত হলে তা হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শাস্তি।

শাসককে সংশোধন করবে আলেম সমাজ।

শাসক যদি আলেমের সাহচর্যে থেকেও না শোধরায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে আলেমের দ্বীনকেই নষ্ট করে দিয়েছে। আর আলেম যদি শাসকের সাথে চলাফেরা করেও তাকে সংশোধন না করেন, তাহলে তিনি তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস করে দিয়েছেন।

দাওয়াতের পথে চরমপন্থা, নরমপন্থা উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যবিধান করা জরুরি।

যে বিষয়ের দিকে আহবান করা হচ্ছে, তা হয়তো সঠিক। কিন্তু আহবানকারী অনেকসময় চরমপন্থা অবলম্বন করে ব্যাপারটাকে ভেস্তে দেয়। এর ফলে মানুষ ওই

বিষয়টি ত্যাগ করে। আবার কখনো নরমপন্থা অবলম্বন করে, ফলে দাওয়াতের কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুমিনের হৃদয় শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

কোনো ব্যক্তির রাগ হলো তার ঈমানের মাপকাঠি। সে যার উপাসনা করে ও যাকে ভালোবাসে, তার স্বার্থেই রাগান্বিত হয়। 'আইশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেন, "আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনো ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো উপর প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু যখন আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হতো, তখন তিনি আল্লাহর জন্যই প্রতিশোধ নিতেন।" (বুখারি: ৩৩৬৭, মুসলিম: ৬১৯০)

কেউ যখন নিজের দ্বীন, জান, মালের রক্ষায় লড়াই করে ফিতনা সেটা নয়, বরং যারা এ কাজের বিরোধিতা করে তারাই ফিতনার সৃষ্টি করে।

যারা বলে শামের অধিবাসীরা তাদের দ্বীন, জীবন ও সম্পদের প্রতিরক্ষা করার মাধ্যমে ফিতনা করছে, তাদের কাজকে হারাম বলে ফাতওয়া দেয়, তারা নিজেরাই ফিতনায় পড়ে আছে। আল্লাহ্‌ বলেন,

"তাদের মাঝে কেউ বলে, 'আমাকে (জিহাদে না যাওয়ার) অনুমতি দিন আর আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' নিশ্চয় তারা নিজেরাই ফিতনায় পড়ে আছে।" (সূরাহ্‌ আত-তাওবাহ্‌ ৯:৪৯)

দ্বীনের পথে যারা আহবান করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আসবেই।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর বিরুদ্ধে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করাটাই প্রমাণ করে যে সবগুলো অভিযোগই মিথ্যা। নবীজীর ﷺ ব্যাপারে বলা হয়েছিলো যে তিনি কবি, পাগল ও জাদুকর। তারা এমন সব অভিযোগ একত্রিত করেছে যার একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যহীন।

"লক্ষ করো, তারা তোমার সম্পর্কে কেমন সব উদাহরণ দিচ্ছে! যার ফলে তারা পথহারা হয়ে গেছে আর তারা কখনো পথ পাবে না।" (সূরাহ্‌ আল-ইসরা ১৭:৪৮)

কেন আমাদের দু'আ কবুল হয় না?

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ত্যাগ করা হলো দু'আ কবুল না হওয়ার কারণগুলোর অন্যতম। হাদিসে এসেছে,

"হয় তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে, আর নয়তো শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাঁর আযাব প্রেরণ করবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দু'আ করবে কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" (তিরমিযি: ২১৬৯)

আলেমের নীরবতা উম্মাহর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর।

খারাপ লোকের খারাপ কাজ সমাজে যতটা প্রভাব ফেলে, সেই কাজের বিরুদ্ধে আলেমের নীরবতা তার চেয়ে বেশি খারাপ প্রভাব ফেলে।

অজ্ঞ লোকের মিথ্যা বলার চেয়ে আলেমের সত্য গোপন করা উম্মাহর জন্য বেশি ক্ষতিকর। কেননা আলেমরা যদি সত্যের পক্ষে চুপ থাকেন, তাহলে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য অস্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন,

"আর সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত কোরো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন কোরো না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:৪২)

জাল হাদীস প্রচার হারাম।

জেনেশুনে যারা জাল হাদীস প্রচার করে, তারা সেই জাল হাদীস তৈরি করার সমান গুনাহগার। এছাড়া জাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম হাদীস প্রচার করা হারাম। যে তা প্রচার করে, সে হাদীস জালকারীর সমপর্যায়ের গুনাহগার। কারণ হাদীসে আছে, "মিথ্যা জেনেও যে আমার নামে কোনো হাদীস প্রচার করে, সে দুই মিথ্যাবাদীর একজন।" (বুখারি: ১২৯১)

মিথ্যের উপর ঐক্যের চেয়ে সত্যের উপর বিভেদ উত্তম।

অনেকে সত্যকে চেপে যান, এর মাধ্যমে বিভেদ তৈরি হওয়ার ভয়ে। অথচ মিথ্যের উপর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার চেয়ে হক কথা বলে বিভেদ বাড়ানো বরং উত্তম।

"আর সামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম (এই আদেশ দিয়ে যে) তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। অতঃপর তারা দু'ভাগ হয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লো।" (সূরাহ আন-নামল ২৭:৪৫)

সালিহ তাদেরকে ঈমান ও কুফরের দুটি ক্যাম্পে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন।

মূর্খরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীকে অপবাদ আরোপ করে।

অজ্ঞ লোকেরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীকে খ্যাতিলোভী আর নেতৃত্বলোভী বলে অপবাদ দেয়। এসব অপবাদ নবীগণকেও দেওয়া হয়েছিলো। নূহের ('আলাইহিসসালাম) জাতির লোকেরা তাঁকে বলেছিলো:

"এ তো তোমাদের মতোই মানুষ ছাড়া কিছুই না, সে তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করতে চায়।" (সূরাহ আল-মু'মিনুন ২৩:২৪)

অর্থাৎ, তারা দাবি করেছিলো নূহের লক্ষ্য হলো তার কওমের উপর নিজেকে বড় বলে জাহির করা। অথচ নূহ (আলাইহিসসালাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী যখন সত্যকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করে, মুনাফিক্করা তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা শুরু করে। তারা চায় সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী সত্যের পক্ষে লড়াই ফেলে তার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়ুক। কিন্তু যারা সত্যকে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয়, স্বয়ং আল্লাহ্ তার ব্যক্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব নেন।

পশ্চিমা ইসলাম প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে নামধারী আলেমরা।

পশ্চিমা ধ্যান ধারণা মুসলিম বিশ্বে কখনো স্বনামে শিকড় গাড়তে পারেনি। আজকাল শরিয়তের বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করে এগুলোকে জায়েয করা হচ্ছে। আর এই কাজে পশ্চিমারা ব্যবহার করছে নামধারী আলেমদের। মুসলিম আলেমদের উপর এখন পশ্চিমাদের কতই না ভরসা!

আলেমের দায়িত্ব হলো পূর্ণ দ্বীনের সংরক্ষণ এবং দুনিয়ার সংস্কার সাধন।

শুধু ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রচার-প্রসার করাই আলেমের কাজ নয়। আলেমের দায়িত্ব হলো পূর্ণ দ্বীনের সংরক্ষণ এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে দুনিয়ার সংস্কার সাধন। শুআইব (আলাইহিসসালাম) তাঁর জাতির অবৈধ সম্পদ কামাইয়ের বিরুদ্ধে দাওয়াহ দিয়েছেন। লূত (আলাইহিসসালাম) তাঁর জাতিকে বিকৃত নৈতিকতা থেকে ফিতরাতের (স্বাভাবিক আচরণ) দিকে ফিরে আসার দাওয়াহ্ দিয়েছেন।

রিযিক লাভ হয় দুর্বলকে সাহায্য করার মাধ্যমে।

রিযিক লাভের একটি উপায় হলো শক্তিশালী যালিমের বিরুদ্ধে দুর্বল মাযলুমকে বিজয়ী করা। নবীজী ﷺ বলেন, "তোমাদেরকে যত সাহায্য ও রিযিকই দেওয়া হয়, তা কেবল তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের উসিলায়।" (বুখারি: ২৭৩৯)

মধ্যমপন্থাকে দূষিত করে শাসকের শাহাওয়াত (খাহেশাত) এবং আলেমের শুবহাত (সংশয়)।

সালাফগণ কখনোই বলেননি যে, শাসকের সব অন্যায়কেই গোপনে সংশোধন করতে হবে অথবা সব অন্যায়েরই প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে হবে। মধ্যমপন্থাকে দূষিত করে শাসকের শাহাওয়াত (খাহেশাত) এবং আলেমের শুবহাত (সংশয়)।

মাজলুমকে যাদের সাহায্য করার সামর্থ্য আছে তারা সাহায্য না করার মাধ্যমে নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির যোগ্য বলে প্রমাণ করে।

আল্লাহ্‌ তাঁর অবাধ্য জাতিকে ধ্বংস করে অন্য জাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করে দেন। শামের হাজারো মানুষের ওপর আরোপিত অবরোধ আর কুকুর-বিড়াল খাওয়ার ব্যাপারে আলেমদের ফাতওয়া প্রমাণ করে যে এমন একটি প্রতিস্থাপনের সময় চলে এসেছে। যারা তাদেরকে সাহায্য করতে সমর্থ ছিলো, তারা সাহায্য না করার মাধ্যমে নিজেদেরকে ধ্বংসের যোগ্য বলে প্রমাণ করেছে।

অনুসারীর সংখ্যা নয়, কাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সেটা দেখুন।

জ্ঞানী ব্যক্তি অনুসারীর সংখ্যা দেখে না, কার অনুসরণ করা হচ্ছে সেটা দেখে। কারণ নবীদের চেয়ে ইবলিসের অনুসারী বেশি। হকের একজনমাত্র অনুসারী বাতিলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ দুনিয়ার চেয়ে উত্তম।

আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তনকারী কতই না অভাগা।

নবীজী ﷺ বলেন, "আল্লাহ্‌ তাকে লা'নত করেন যে জমিনের সীমারেখা নির্দেশক চিহ্নগুলো পরিবর্তন করে।" (মুসলিম: ৫২৩৯)

অর্থাৎ অন্যের হক নষ্ট করা যাবে না। তাহলে আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করে যারা আসমানী সীমালঙ্ঘন করে তারা কত অভাগা!

কোন জাতির ভেতর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী না থাকলে আল্লাহ্‌র আযাব ত্বরান্বিত হয়।

চরম জুলুমবাজ জাতির ভেতর সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী থাকলে আল্লাহ্‌ সে জাতিকে রক্ষা করেন। কিন্তু তুলনামূলক কম যুলুমবাজ জাতিও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর অভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

"তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে কোনো জনপদ ধ্বংস করবেন এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী।" (সূরাহ্‌ হুদ ১১:১১৭)

প্রয়োজনে যাকাত আগে আদায় করা উত্তম।

উম্মাহর প্রয়োজনে এক বা দুই বছরের যাকাত অগ্রীম প্রদান করা উত্তম। নবীজী ﷺ তাঁর চাচা 'আব্বাসের (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) দুই বছরের যাকাত আগে আগে নিয়েছেন। বর্তমানে সিরিয়া, আরাকানের লোকেরা আমাদের যাকাতের সবচেয়ে বেশি হকদার।

একটি মেয়েকে সুপথে রাখতে পরিবারের অন্যদের দ্বীনের উপর থাকাটা জরুরি।

পিতামাতা আর ভাইবোন সকলে দ্বীনদার হলে একটি মেয়ে কখনোই বিপথে যেতে পারে না।

“হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো কোনো অসৎ লোক ছিলো না, আর না তোমার মা ছিলো কোনো অসতী নারী।” (সূরাহ মারইয়াম ১৯:২৮)

অতএব, এরাই হলেন মেয়ের জন্য ভালো-খারাপের রোল মডেল।

ফিতনার সময়ে হকের পক্ষে কথা না বলে চুপ করে থাকাটাও একটি ফিতনা।

সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা হলো বাস্তবতাকে উল্টে দেওয়া। অর্থাৎ বাতিলকে বৈধ বানানো আর হককে অবৈধ ঘোষণা করা। এরকম ফিতনার সময়ে হকের পক্ষে কথা না বলে চুপ করে থাকাটাও একটি ফিতনা।

“আগেও তারা ফিতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছে আর তোমার অনেক কাজ নষ্ট করেছে।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৮)

এই চরম দুঃখ দুর্দশা শেষেই উম্মাহর বিজয় আসবে।

উম্মাহ চরম প্রসব বেদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রসব বেদনার ফলে নবজাতকের জন্ম হয়। আর নবজাতক জন্মেই কান্না করে। হে আল্লাহ! আপনার দ্বীনকে সম্মানিত করুন আর আপনার শত্রুদের লাঞ্ছিত করুন।

কাফেরদের আনুগত্য করা সবচেয়ে বড় ফিতনা।

শাসকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো মুসলিমদের ছেড়ে কাফিরদের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাঁর নিষ্পাপ নবীকে ﷺ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাবধান করে বলেছেন,

“হে নবী! আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য কোরো না।” (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:১)

বিচার-বিবেচনা আল্লাহ্‌র দেওয়া মানদণ্ডের ভিত্তিতেই করুন।

সুস্পষ্ট অসৎ কাজের ব্যাপারে চুপ থেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ অসৎ কাজকে বাধা দিতে যাবেন না। হোক তা কাউকে খুশি করার জন্য বা কাণ্ডজ্ঞানহীনদের সাথে তাল মেলানোর জন্য। আল্লাহ আপনাকে ভালো-মন্দের মানদণ্ড জানিয়ে দিয়েছেন। বিচার করলে এর ভিত্তিতেই করবেন।

জুলুম দেখে সাহায্যে এগিয়ে না আসা নির্বাক দর্শকরাও আযাব ভোগ করবে।

জালিমের জুলুম বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যদি মাজলুমের সাহায্যকারীও হ্রাস পায়, তাহলে বুঝতে হবে যালিমের পাশাপাশি নির্বাক দর্শকদের জন্যও আল্লাহর আযাব প্রস্তুত হচ্ছে। মাযলুমকে সহায়তা করতে গিয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাটা আল্লাহর পরীক্ষা। আল্লাহর সুন্নাহ (কর্মপদ্ধতি) সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় মানুষ পরীক্ষা থেকে পালিয়ে শাস্তির দিকে দৌড়াচ্ছে।

যারা মানুষকে দুনিয়ায় কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে কষ্ট দেবেন।

কয়েদীদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম, এমনকি তা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার মাধ্যমে হলেও। হিশাম বিন হাকিম কিছু কয়েদীকে দেখলেন যাদেরকে রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিলো। তিনি তা দেখে বললেন, নবীজী ﷺ বলেছেন, যারা মানুষকে দুনিয়ায় কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ তাদেরকে কষ্ট দেবেন।" (মু'জাম আত-তাবারানি: ৪৬৮)

কাউকে অন্যায়ভাবে বন্দী করাটা কতই না গুরুতর!

কাউকে অন্যায়ভাবে তার ভূমি থেকে বহিষ্কার করাকে আল্লাহ্ অবৈধ রক্তপাতের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন। তাহলে অন্যায়ভাবে বন্দী করাটা কতই না গুরুতর!

"তোমরা একে অন্যের রক্তপাত ঘটাবে না এবং স্বজনদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে না।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২:৮৪)

মাজলুম মানুষকে সাহায্য করাটা কতই না নেকির কাজ!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার এক বাগানে প্রবেশ করলেন। একটি উট তাঁকে দেখলো। তাঁর চোখে পানি এলো। তিনি এর মালিককে ডেকে বললেন, "এটি আমার কাছে নালিশ করেছে যে তুমি তাকে অভুক্ত রাখো এবং তার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপাও।"

একটি প্রাণীর প্রতি যুলুম করা হচ্ছিলো আর নবীজী ﷺ সেটিকে সাহায্য করেছেন। তাহলে মাজলুম আল্লাহর বান্দাকে সাহায্য করাটা কতই না নেকির কাজ!

আল্লাহ্ নবী রাসূল এবং সত্যের পথে আহবানকারীদের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী থেকে কেন বাছাই করেন?

বেশিরভাগ নবী এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীকে আল্লাহ্ নির্বাচন করেছেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী থেকে। কারণ যদি বিত্তশালী এবং প্রাচুর্যের মধ্য থেকে কাউকে বাছাই করতেন তাহলে দুনিয়াবি সুবিধার লোভেও অনেকে তাদের কাছে গিয়ে ভিড়তো। এখন শুধু প্রকৃত নিষ্ঠাবানেরাই তাঁদের অনুসরণ করবেন এবং লোভী ও অহংকারীরা দূরে সরে যাবে। এজন্যই তাঁদের অনুসারীরা দুর্যোগের সময় অবিচল থাকেন, কারণ তারা দুনিয়ার অনুসারী নয়, সত্যের অনুসারী।

মাজলুমকে সাহায্য করা ফরয।

মাযলুমকে সাহায্য করা ফরয। সাহায্য করার মহত্তম ও সহজতম মাধ্যম হলো দু'আ। রাসূল ﷺ এক হাদীসে বলেন, "আল্লাহর নিকট দু'আর চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কিছুই নেই।" (তিরমিযি: ৩৩৭০)

আলেম যখন বাতিলের সমর্থক!

আলেম যদি প্রকাশ্য অন্যায় দেখে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চুপ করে থাকেন, তাহলে তিনি যেন সেই অন্যায়কে সমর্থনের ঘোষণা দিলেন। ইয়াহুদী আলেমরা মিথ্যা শোনার পরও চুপ থাকতো বলে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন,

"তারা বেশি বেশি মিথ্যে শুনতে আগ্রহী, হারাম ভক্ষণকারী।" (সূরাহ মা'ইদাহ ৫:৪২)

মানুষকে সংস্কারের জন্য চাই নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং শক্তিশালী যুক্তির উপস্থাপন।

আল্লাহ পুরো একটি জাতির সংশোধন কেবল একজন ব্যক্তিকে দিয়েই করিয়ে নিতে পারেন যদি ব্যক্তিটির নিয়্যাত বিশুদ্ধ হয় আর যুক্তি শক্তিশালী হয়।

"অতঃপর তাকে (ইউনুস আলাইহিসসালাম) এক লাখ বা তার চেয়ে বেশি লোকের কাছে পাঠালাম। তারা ঈমান আনলো, কাজেই আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম।" (সূরাহ আস-সফফাত ৩৭:১৪৭-১৪৮)

সুতরাং যেসব মহান ব্যক্তিরা একাই এক একটা জাতিকে সত্যের পথে ধাবিত করেছেন তাদের মূল অস্ত্র ছিলো দুইটা— নিয়তের বিশুদ্ধতা এবং শক্তিশালী যুক্তির উপস্থাপন।

আল্লাহ্র অনুগ্রহ অব্যাহত রাখা এবং হারিয়ে ফেলা।

আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে অব্যাহত রাখার সব থেকে বড় মাধ্যম হচ্ছে অপরাধীকে সহায়তা না করা। মূসা (আলাইহিসসালাম) তাঁর প্রতিপালককে বলেছিলেন,

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি যেহেতু আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই আমি কখনোই পাপীদের সাহায্যকারী হবো না।" (সূরাহ আল ক্বাসাস ২৮:১৭)

আর অনুগ্রহ হারিয়ে ফেলার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো যিনি সেই অনুগ্রহ দান করেন সেই আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের কাছে না চেয়ে অন্য কারো কাছে অনুগ্রহ চাওয়া।

এক দ্বীন ইসলামের উপর ঐক্যবদ্ধ হলেই জাতি-ধর্ম সকলেই রক্ষা পেতো।

প্রায়ই স্লোগান তোলা হয় ধর্মে-ধর্মে ভেদাভেদ না করে জাতি হিসেবে একত্রিত থাকতে। অথচ যেভাবে তারা জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে বলে, সেভাবে যদি দ্বীন ইসলামের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিতো, তাহলে তাতে ধর্ম ও জাতি উভয়কূল রক্ষা হতো।

কাজে প্রমাণ না দিয়ে শুধু কথার জোরে কেউ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হতে পারে না।

কাজেকর্মে দুষ্কৃতিকারীদের সাথে তাল মিলিয়ে চললে শুধু কথার জোরে কেউ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী হতে পারে না। মূসা (আলাইহিসসালাম) তাঁর ভাই হারুনকে (আলাইহিসসালাম) উপদেশ দিয়েছিলেন,

“আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের জন্য তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করো, সংশোধন করো, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ কোরো না।” (সূরাহ আল-আ’রাফ ৭:১৪২)

দুনিয়ার রজ্জু যারা ধরে তারা দ্বীনের রজ্জু ছেড়ে দেয়।

যদি শাসক এবং আলেমের মাঝে একটি টাকার রজ্জু বাঁধা হতো, তাহলে সত্য এবং ন্যায়ের রজ্জুগুলো ঢিলা হয়ে যেতো।

অন্যায় দেখতে দেখতে যে সেটাকে আর অন্যায়ই মনে করে না তার ঈমান নেই।

অন্যায় দেখেও চুপ থাকতে থাকতে যে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, অন্তর দিয়েও সে আর অন্যায়কে ঘৃণা করে না, তার কোনো ঈমানই নেই। এমনকি দুর্বল ঈমানও নেই, তা সে যত বড় আবেদ হোক না কেন। কারণ কোন অন্যায় হতে দেখলে সবচেয়ে নিম্ন ঈমানের পরিচায়ক হলো সেটা মন থেকে ঘৃণা করা, এরপরে আর কোন ঈমান নেই। হাদীসে আছে, “যদি তাও না পারে, তাহলে অন্তর দিয়ে, আর এটিই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।”

লোভ-লালসা আর সংশয় জাতির পতনের কারণ।

জাতিসমূহের পতন হয় শাহাওয়াতের (লোভ-আকাঙ্ক্ষা) জন্যে আর চিন্তাধারার পতন ঘটে শুবহাতের (সংশয়) জন্যে। যদি কোনো জাতি বাঁচতে চায়, তাহলে তাকে তার নেতাকে শাহাওয়াতের মধ্যে ডুবতে দেওয়া যাবে না এবং আলেমকে শুবহাতের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

যারা সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, তাদের জানমাল আল্লাহ কিনে নিয়েছেন।

হে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারী! আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করার ইচ্ছে করেছেন। তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে আপনার দুনিয়া রক্ষা করার কথা এখানে বলা হয়নি। আপনার কোনো দুনিয়াবি লোকসান হয়ে থাকলে সেটা আল্লাহর সাথে আপনার চুক্তিরই অংশ। কারণ তিনি আপনাকে আপনার কাছ থেকেই কিনে নিয়েছেন।

হকপন্থী আলেমরা হারামের দিকে ধাবিত করে এমন হালালের ব্যাপারেও কঠোর থাকেন।

যেই মাকরুহ (অপছন্দনীয় আমল) হারামের দিকে ধাবিত করে না, সেগুলো নিয়ে হকপন্থী আলেমগণ টানাহেঁচড়া করেন না। কিন্তু হারামের দিকে ধাবিত করে এরকম হালালের ব্যাপারেও তাঁরা কঠোর থাকেন। এটিই তাঁদের দূরদর্শিতা।

মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলে প্রকাশ্য অনৈতিকতা ও গোপন ভণ্ডামি উভয়ই রোধ করা যায়।

প্রকাশ্য পাপাচার রোধ করতে চরমপন্থা অবলম্বন করলে গোপন গুনাহের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার গোপনে গুনাহ করা রোধ করতে চরমপন্থা অবলম্বন করলে প্রকাশ্য পাপাচার ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলে প্রকাশ্য অনৈতিকতা ও গোপন ভণ্ডামি উভয়ই রোধ করা যায়।

আলেমগণকে আম জনতার নেতৃত্ব থেকে নামিয়ে দিলে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে।

আলেমগণকে যদি কোনো কারণ ছাড়াই আমজনতার নেতৃত্ব দেওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তাহলে বিপদের সময় আমজনতা নিজেই নিজের নেতৃত্ব দিতে শুরু করবে। আর এভাবেই ফিতনার শুরু হয়।

অসাধু উপদেষ্টার ফিতনা।

কোনো জাতির পতন ঘটে অসাধু উপদেষ্টার কারণে। তারা ভালোকে নাগালের বাইরে নিয়ে যায়, আর মন্দকে নাগালের মধ্যে এনে দেয়। ফলে নেতার সাথে অনুসারীদের বিরোধ লাগে আর ঐক্যবদ্ধ জাতির মাঝে বিভেদ আসে।

আপনজনের পক্ষে ফায়সালা দেওয়ার জন্য সত্যকে পরিবর্তন করা চলবে না।

শাসকের কবীরা গুনাহ দেখেও তা গোপন রাখা আর আলেমের সগীরা গুনাহ প্রচার করে বেড়ানো কোনো নিষ্ঠাবান ব্যক্তির কাজ নয়। সত্য হলো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড। আপনজনের পক্ষে ফায়সালা দেওয়ার জন্য সত্যকে পরিবর্তন করা চলবে না।

অন্যায়ভাবে কারাবন্দী ব্যক্তি প্রতিনিয়ত যালিমের বিরুদ্ধে দু'আ করে যায়।

মাযলুমও মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে যালিমের বিরুদ্ধে দু'আ করতে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু অন্যায়ভাবে কারাবন্দী ব্যক্তির কথা আলাদা। মুক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রতিটা মুহূর্ত তার বদ দু'আ আসমানের দ্বারসমূহে টোকা দিতে থাকে।

নেতৃত্বের জন্য নিজেরা মারামারিতে লিপ্ত থাকলে শত্রুরা এসে সহজেই ওই খালি জায়গাটা দখল করে নেবে।

উম্মাহ হলো একটি দেহের মতো যা একটি হৃদয় দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়। উম্মাহর মাঝে দুইজন নেতা থাকাটা এক মানবদেহে দুই হৃদয় থাকার মতোই ক্ষতিকর। রাসূল ﷺ বলেন, "মুমিনদের উদাহরণ একটি দেহের মতো।" (মুসলিম: ৬৭৫১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
"আল্লাহ কোনো মানুষের ভেতর দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি।"
(সূরাহ আল-আহযাব ৩৩:৪)

এই উম্মাহর সবাই যদি পিরামিডের চূড়ায় উঠে বসতে চায়, তাহলে তারা কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। কারণ সেখানে একজনের জন্যই জায়গা আছে। নেতৃত্বের জন্য নিজেরা মারামারিতে লিপ্ত থাকলে শত্রুরা এসে সহজেই ওই খালি জায়গাটা দখল করে নেবে।

মু'মিনদের বিরুদ্ধে যারা কাফেরদের সাথে জোট বাঁধে তাদের নিশ্চিত ফলাফল হলো অপমানজনক পরাজয়।

মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে জোট করে মর্যাদা খোঁজা হলো মরীচিকা। আর এমন জোটের নিশ্চিত ফলাফল হলো অপমানজনক পরাজয়।

"যারা মুমিনদেরকে ছেড়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট ইজ্জত চায়? ইজ্জতের সবকিছুই আল্লাহর অধিকারে।"

(সূরাহ আন-নিসা ৪:১৩৯)

শাসকের পদস্খলনের চেয়ে আলেমের পদস্খলন বেশি ক্ষতিকর।

শাসকের পদস্খলনের চেয়ে আলেমের পদস্খলন বেশি ক্ষতিকর। কারণ শাসকের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কুপ্রভাব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আলেমের মৃত্যুর পরও তার কুপ্রভাব রয়ে যায়।

পুরুষ যেখানে উপার্জন করতে বাধ্য, নারীর সেখানে স্বাধীনতা রয়েছে উপার্জন করা বা না করার।

স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সেই নারীর ব্যয়ভার বহন করা। তাকে চাকরি অফার করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘর থেকে টেনে বের করা না। পুরুষ যেখানে উপার্জন করতে বাধ্য, নারীর সেখানে স্বাধীনতা রয়েছে উপার্জন করা বা না করার।

শাসক আর অনুসারী দুটোই আলেমের জন্য ফিতনা।

আলেমের অবস্থান দুই ফিতনার মাঝে-শাসকের ফিতনা আর অনুসারীর ফিতনা। সত্য এর কোনটার কাছেই মাথা নত করে না।

পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নীরব থাকাই উত্তম।

সত্য বলার কারণে বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার পর প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি বিরোধিতাকারীর প্রতি আপনার মনে ব্যক্তিগত আক্রোশ চলে আসে, তাহলে চুপ হয়ে যান। অর্ধেক আল্লাহর সন্তুষ্টি আর অর্ধেক নিজের সন্তুষ্টির জন্য কথা বলার চেয়ে পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নীরব থাকাই উত্তম।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীর দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

সাধারণ নেককার লোকদের কাছে দু'আ না চেয়ে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধকারীদের কাছে দু'আ চাইলে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

নবীজী ﷺ বলেছেন,

"তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকো। নয়তো আল্লাহ তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাবেন। তারপর তোমরা তাঁর কাছে দু'আ করলেও তা কবুল করা হবে না।" (তিরমিযি: ২১৬৯)

পক্ষপাততুষ্ট জ্ঞান হলো খাহেশাত আর জ্ঞানবিহীন নিরপেক্ষতা বিপদজনক।

যেই আলেম ফিতনা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন, তাঁর মাঝে দুটি জিনিসের সমাবেশ ঘটেছে:

—ফিতনার বাস্তবতা ও এর ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান

—লোভবিহীন নিরপেক্ষতা।

কারণ পক্ষপাতদুষ্ট জ্ঞান হলো খাহেশাত। আর জ্ঞানবিহীন নিরপেক্ষতা বিপদজনক।

মুজাহিদ, আলেম আর শাসকদেরই সবচেয়ে বেশি নসিহত প্রয়োজন।

মুজাহিদ, আলেম আর শাসকদেরই সবচেয়ে বেশি নসিহত প্রয়োজন। কারণ মুজাহিদের ভুলে রক্তপাত ঘটে, আলেমের ভুলে দ্বীন বিকৃত হয় আর শাসকের ভুলে দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বিপন্ন হয়ে যায়।

বদ আমলের প্রতি সম্মতি জানালেও এর ফল ভোগ করতে হবে।

বদ আমলের প্রতি সম্মতি জানালে এ থেকে দূরে থাকা ব্যক্তিও সেই বদ আমলের খারাপ পরিণতির শিকার হয়। নবীজী ﷺ বলেন, “জমিনে কোনো পাপ করা হলে কেউ এটি না দেখেও যদি এর ব্যাপারে সম্মতি জানায়, তাহলে সে যেন পাপটি সংঘটিত হতে দেখলো (তবুও বাধা দিলো না)।”

অন্তরের ব্যাধিসমূহ

আমাদের প্রিয় নবীজী ﷺ বলেছেন, "... সাবধান! আমাদের শরীরে এমন একটি মাংস পিণ্ড রয়েছে যা সুস্থ (পরিশুদ্ধ) থাকলে সারা শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু যদি তা কলুষিত হয়ে যায় সারা শরীর কলুষিত হয় এবং সেটি হচ্ছে হৃদয়।" (বুখারি)

আমাদের সেই হৃদয় নানান সব ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। কখনো নিফাক এসে ভর করে, কখনো এমন সব কথা আর কাজ হয়ে যায় যা আমাদের আমলগুলোকেই বরবাদ করে দেয়, কখনো মনের অজান্তেই ধীরে ধীরে আমাদের হৃদয়গুলো দ্বীনের বিরুদ্ধে চলে যায়। অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষোভ, জিহবার অসংযত ব্যবহার আমাদের সেই হৃদয়ে কালো দাগ ফেলে যায় প্রতিনিয়ত। আল্লাহর আনুগত্য তখন আর ভালো লাগে না, ইবাদাতকে বোঝা মনে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা অন্তরের ব্যাধিসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছি। শাইখ অন্তরের ব্যাধিগুলো যেমঞ্জ শনাক্ত করেছেন, এর স্বরূপ উন্মোচন করে প্রয়োজনীয় করণীয় নিয়েও আলোচনা করেছেন।

অহংকারী হৃদয় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আনুগত্যে সালাতে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানায়।

"তাদের চিহ্ন হলো, তাদের মুখমণ্ডলে সেজদাহর চিহ্ন পরিস্ফুটিত হয়ে আছে।" (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮:২৯)
সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, মুজাহিদ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, "এটি হলো বিনয়।"

এর বিপরীতে অহংকারী ব্যক্তি হয় সালাতে অনিয়মিত, না হয় একেবারেই বেনামাজি। যে হৃদয় থেকে বিনয় হারিয়ে যায় সে হৃদয়ে অহংকার প্রবেশ করে। অহংকারী হৃদয় আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের আনুগত্যে সালাতে দাঁড়াতে অস্বীকৃতি জানায়।

দুনিয়ার ভোগ বিলাস বান্দার জন্য আযাবস্বরূপ।

মানুষ দুনিয়ার ভোগ বিলাসে ডুবে থেকে ভাবে সে কতই না আরামে আছে। অথচ সবচেয়ে কঠিন আযাবগুলোর একটি হলো দুনিয়াবি ভোগ-বিলাসের আযাব। এই আযাবকে মানুষ ছাড়তে চায় না, তাই আযাবের এই চক্র চলতেই থাকে।

"তাদের মালধন আর সন্তান-সন্ততি তোমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়, দুনিয়াতে আল্লাহ সেসব দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে করেন।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৮৫)

দুনিয়ার লোভ আর গোপন পাপের কারণে হকের পক্ষে থেকেও পরাজয় বরণ করতে হয়।

হকের পথে লড়াই করেও মুজাহিদরা পরাজয় বরণ করে দুনিয়ার লোভ আর গোপন পাপের কারণে, শত্রুদের সংখ্যা বা শক্তিমত্তার কারণে নয়। ইবনে মাস'উদ বলেন, "যদি আমি উহুদের দিন শপথ করতাম যে,আমাদের মধ্যে এমন কেউই ছিলো না যে দুনিয়া কামনা করে, তাহলে আমার কথা ঠিকই হতো। কিন্তু আল্লাহ আয়াত নাযিল করে সত্যটা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন,

"তোমাদের মধ্যে কতিপয় লোক এমন আছে যারা দুনিয়া কামনা করে।"
(সূরাহ আল-ইমরান ৩:১৫২)

মুনাফিকরা নিজেদের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকে।

মুনাফিক ব্যক্তিই সমালোচনাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। কারণ সে যা প্রকাশ করে, তার চেয়ে অনেক গুরুতর বিষয় অন্তরে গোপন করে।

তাই সে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সর্বদা ভীত থাকে।

"আর যখনই কোনো সূরাহ নাযিল হয়, তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, বলে, 'তোমাদেরকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না তো?' তারপর তারা চুপিসারে সরে পড়ে।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:১২৭)

মুনাফিকরা যখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

উম্মাহর মাঝে মুনাফিকরা দুইটি সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

—যখন বহিঃশত্রু শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
—যখন উম্মাহ ছোটখাটো মতপার্থক্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এজন্যই মুনাফিকরা জিহাদকে ঘৃণা করে, কারণ জিহাদ চলমান থাকলে উম্মাহর মাঝে এই দুটি পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয় না।

মুনাফিকদের দান করলে খুশী হয়, দান বন্ধ করে দিলে ক্ষুব্ধ হয়।

মুনাফিকদেরকে যারা দান করে, তারা বাতিলপন্থী হলেও মুনাফিকরা তাদের প্রশংসা করে। আর যারা তাদেরকে দান করে না, তারা হকপন্থী হলেও মুনাফিকরা তার নিন্দা করে।

"তাদেরকে (সদকা থেকে) দেওয়া হলে তারা খুশি হয়। আর না দেওয়া হলে সাথে সাথে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৫৮)

প্রতিপক্ষকে বিদ্রুপ করা পরাজিতদের হাতিয়ার।

বিদ্রুপ হচ্ছে সেইসব ব্যক্তির টিকে থাকার সম্বল যাদের যুক্তি-প্রমাণ দুর্বল। বিতর্কের সময় বিদ্রুপকে এরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এর মধ্যে এমন এক মাদকতা রয়েছে যা বিদ্রুপকারীদেরকে একপ্রকার বিজয়ের অনুভূতি অনুভব করায়। এটি সে নিজে ছাড়া অন্য কেউই অনুভব করে না। যখন সেই মাদকতার ঘোর কেটে যায়, তখন সে তার পরাজয় বুঝতে পারে।

লোকবল এবং ধন-সম্পদ অন্তরে অহংকার তৈরি করে।

নিজের বিশাল অনুসারীবাহিনী ও সম্পদকে অন্যের সাথে তুলনা করলে অন্তরে স্বৈরাচারসুলভ অহংকার জন্ম নেয়।

"লোকটির উৎপাদন ছিলো প্রচুর। একদিন কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বললো, 'আমি সম্পদে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।' (অহংকার ও কুফরের মাধ্যমে) নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো।" (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৩৪-৩৫)

মুনাফিকরা দুনিয়ার জন্য দ্বীন বেচে দেয়।

পরিপূর্ণ দ্বীনদার হতে গিয়ে দুনিয়াবি ক্ষতি হলেও মুমিন আনন্দিত হয়। আর দ্বীন বেচে হলেও দুনিয়া হাসিল করতে পারলে আনন্দিত হয় মুনাফিক।

"তোমার ওপর বিপদ আসলে তারা খুশির সঙ্গে একথা বলতে বলতে সরে পড়ে যে, 'আমরা আগেই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম।'"
(সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৫০)

দীর্ঘদিন খারাপ কাজ করার ফলে অন্তর সেই কাজটিকে ভালোবাসতে শুরু করে।

খারাপ কাজ করতে ভালো লাগলেই সেটি ভালো কাজ হয়ে যায় না। দীর্ঘদিন খারাপ কাজ করার ফলে অন্তর সেই কাজটিকে ভালোবাসতে শুরু করে। ঠিক যেমন গরম পানিতে হাত রাখলে প্রথমে কষ্ট হয়, তারপর ধীরে ধীরে তা সয়ে আসে।

মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কখনোই পার পায় না, আর মিথ্যাবাদী জাতি কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

মিথ্যা বলার ব্যাপারে ইসলামী বিধান কোনো বিশেষ দিবস উপলক্ষে পাল্টে যায় না। অন্যান্য সময় মিথ্যা বলা যেমন হারাম, এপ্রিল মাসেও তা-ই। এটি সবচেয়ে ঘৃণ্য স্বভাবগুলোর মধ্যে একটি। মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কখনোই পার পায় না, আর মিথ্যাবাদী জাতি কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

মন্দকাজ একসময় ধর্মে পরিণত হয়।

সমাজে মন্দ কাজের মর্যাদা ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হতে থাকে। এটি পাপাচার হিসেবে শুরু হয়, তারপর ঐতিহ্য হয়ে যায়, শেষে গিয়ে একসময় তা ধর্মে পরিণত হয়।

"তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে তখন তারা বলে, 'আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে এ কাজই করতে দেখেছি, আর আল্লাহ আমাদেরকে এসব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।'" (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২৮)

যে নিজের অপরাধ স্বীকার করে না তার অন্তরে অহংকারের তালা পড়ে যায়।

এক যালিম আরেক যালিমের পরিণতি দেখে শিক্ষা নেয় না, কারণ সে তো নিজেকে যালিম মনেই করে না। নিজের অপরাধ স্বীকার করা হলো জ্ঞানার্জনের চাবি, আর অহংকার হলো তালা। যে নিজের অপরাধ স্বীকার করে না তার অন্তরে অহংকারের তালা পড়ে যায়। আর তাই অহংকারী কখনোই শিক্ষা নেয় না।

সত্য মিথ্যার লড়াইয়ে হকের পক্ষে থেকেও কারো কারো পা পিছলাতে পারে।

প্রত্যেক যুগেই যখন হকের বিরুদ্ধে বাতিল আওয়াজ তোলে, তখন হকপন্থীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি হকের পথ থেকে পিছলে গিয়ে হক-বাতিলের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। এর কারণ হয় ঈমানী দুর্বলতা, না হয় মুনাফেকি। বাতিলের পতন ঘটলে তারা আবার ফেরত আসে।

হৃদয়ের পারিশ্রমিক হলো প্রশংসা।

হাত যেভাবে পারিশ্রমিক নেয়, হৃদয়ও সেভাবে পারিশ্রমিক নেয়। হৃদয়ের পারিশ্রমিক হলো প্রশংসা। কেউ যদি হৃদয়ের পারিশ্রমিকের আশায় হক কথা বলে, তাহলে পারিশ্রমিকে ঘাটতি হলে হক কথা বলাও সে কমিয়ে দিবে।

পর্যুদস্ত মানুষ মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে হলেও টিকে থাকতে চায়।

কিছু মানুষ কোনো ভুল মতকে গ্রহণ করে সেটির দৃঢ়তার জন্য না। বরং তারা এতই পর্যুদস্ত থাকে যে, খড়কুটো আঁকড়ে ধরে হলেও সে উপরে উঠতে চায়।

মানুষ তার মনকে ভুলের ঊর্ধ্বে ভেবে পূজা করতে থাকে।

মানুষ তার মনকে ভুলের ঊর্ধ্বে ভেবে পূজা করতে থাকে। তার বেশিরভাগ চিন্তাই গতকাল কেন্দ্রিক। "ইশ! আমি যদি এটা না করে ওটা করতাম!" সে আজকের মনকে পূজা করে আর গতকালের মনকে অভিশাপ দেয়। অথচ তার গতকালকের মন আর আজকের মন একই জিনিস।

কারো শেষ সময়ের আমল হবে তার পরিণতি আনুযায়ী।

বাহ্যিকভাবে নেক আমলকারী ব্যক্তি ভেতরে ভেতরে মন্দ হয়ে থাকলে তার শেষ পরিণতিও মন্দ হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি জাহান্নামী হওয়া সত্ত্বেও জান্নাতীদের মতো কাজ করে যেতে পারে, কিন্তু শেষ সময়ের আমল হবে তার পরিণতি আনুযায়ী।"

মুসলিমদের চেয়ে ইয়াহুদীদের সাথে মুনাফিকদের সখ্যতা বেশি।

মুনাফিকের চিহ্ন হলো ইসলাম ও মুসলিমদের চেয়ে ইয়াহুদীদের প্রতি বেশি সখ্যতা থাকা।

"আহলে কিতাবের মধ্যে যারা কুফরি করে, মুনাফিকরা তাদের সেসকল দোস্তদেরকে বলে, 'তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে অবশ্যই আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো।'" (সূরা আল-হাশর ৫৯:১১)

বিচারের সময় যতই এগিয়ে আসে, মানুষ ততই অপরাধ করা বাড়িয়ে দেয়!

জীবনের একেকটি বছর হলো আল্লাহর নিকট ফিরে যাওয়ার সিঁড়ির একেকটি ধাপ। প্রতিটি ধাপ বান্দাকে একটু একটু করে তার বিচারদিবসের কাছে নিয়ে যায়। বিচারের সময় যতই এগিয়ে আসে, মানুষ ততই অপরাধ করা বাড়িয়ে দেয়! কী অদ্ভুত!

কারো গোপন পাপের খবর ছড়ালে সেই পাপের সমান গুনাহের ভার বহন করতে হবে।

কারো গোপন পাপাচারের খবর যে ছড়িয়ে দিলো, সে ওই পাপাচারীর সমান গুনাহগার। আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "যে কোনো পাপাচারের কথা শুনে তা ছড়িয়ে দিলো, সে যেন ওই পাপাচারীর মতোই।"

সুবিধাবাদীদের দ্বিমুখী আচরণ।

জাদুটোনা থেকে যখন ফির'আউনের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, তখন সে সেটির জন্য তলব করেছে।

"আর ফির'আউন বললো, 'আমার কাছে প্রত্যেক দক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এসো।'"
(সূরাহ ইউনুস ১০:৭৯)

আর মূসা যখন তাকে সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখালেন, তখন জাদু তার কাছে হয়ে গেলো প্রতারণার কৌশল।

"তারা বললো, 'এ তো অলীক জাদু মাত্র!'" (সূরাহ ক্বাসাস ২৮:৩৬)

নিজের অজ্ঞতার ব্যাপারে না জানার ফলে মানুষ বিনয়ী না হয়ে যা জানে সেটা নিয়ে অহংকারী হয়।

মানুষ তার সূচনালগ্ন থেকে প্রতিদিনই নতুন নতুন জিনিস শিখছে। নিজের জ্ঞানের পরিমাণ সে দেখতে পায় বলে তা নিয়ে অহংকার করে। কিন্তু নিজের অজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা দেখতে পায় না বলে বিনয়ী হতে ভুলে যায়।

"আর তোমাদের (মানবজাতিকে) অল্পই জ্ঞান দান করা হয়েছে।"
(সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৮৫)

দুনিয়ার প্রতি লোভ আখিরাতের ব্যাপারে মানুষকে উদাসীন করে দেয়।

মাত্রাতিরিক্ত আশা আর আখিরাতের ব্যাপারে উদাসীনতার লক্ষণ হলো দুনিয়ার প্রতি লোভ। আল্লাহ এ ব্যাপারে বলেন,

"আর নিশ্চয়ই সে ধনসম্পদের প্রতি প্রবল আসক্ত।" (সূরাহ আল-আদিয়াত ১০০:৮)

তারপর তিনি এর কারণ উল্লেখ করেন,

"সে কি জানে না যে, কবরে যা আছে তা যখন উত্থিত হবে?"
(সূরাহ আল-আদিয়াত ১০০:৯)

বাহ্যিকভাবে যার দ্বীন নেই, অন্তর থেকেও একদিন তা হারিয়ে যাবে।

অনেকেই হয়তো ভাবে দ্বীন বাহ্যিকভাবে দেখানোর কিছু নেই, অন্তরে থাকলেই হলো। কিন্তু যার মাঝে দ্বীনের বাহ্যিক কোনো লক্ষণ নেই, তার অন্তর থেকেও দ্বীনের প্রভাব একদিন না একদিন মুছে যাবে।

মুনাফিকদের শেষ আশ্রয় হলো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।

মুনাফিকরা যেই সত্যকে গোপন করে আর যেই মিথ্যাকে প্রকাশ করে, এ দুটির মাঝে দোদুল্যমান থাকে। তারা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকে। আর এই দুশ্চিন্তার প্রকাশ ঘটে ঠাট্টা-বিদ্রুপের মাধ্যমে।

"মুনাফিক্বরা ভয় করে যে তাদের মনের কথা প্রকাশ করে কোনো সূরাহ্ নাযিল হয়ে যায় কি না! বলো, 'ঠাট্টা করতে থাকো, তোমরা যে ব্যাপারে ভয় পাও তা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৬৪)

আর আলেমদের মাঝে কোনো মতভেদ নেই যে নবীজীকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঠাট্টা করা ও নিন্দা করা কুফরি, যা ওই ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়:

"বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে ঠাট্টা করছিলে?কোনো অজুহাত পেশ কোরো না। তোমরা ঈমান আনার পর কুফরি করেছো।'" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৬৫-৬৬)

খেয়াল খুশির বশবর্তী হয়ে মিথ্যা ফাতওয়া দিলে সেই ভুল স্বীকার করেই তাওবা করতে হবে।

যে খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে মিথ্যা ফাতওয়া দেয়, সে প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার না করলে তার তাওবাহ্ কবুল হবে না। কারণ যারা মিথ্যা ফাতওয়া দেয়, তাদের অভিসম্পাত করার পর আল্লাহ্ বলেন, "তারা ব্যতীত যারা তাওবাহ্ করে ও নিজেদের শুধরে নেয়, আর প্রকাশ্যে ঘোষণা করে (যা তারা গোপন রেখেছিলো)।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:১৬০)

অপরাধের ভয়াবহতা স্বীকার না করলে সেই অপরাধ থেকে বের হয়ে আসা অসম্ভব।

নিজের গুনাহ যে স্বীকার করে না, তার তাওবাহ করার সুযোগ হয় না। কারণ গুনাহের ভয়াবহতা স্বীকার না করলে তা পরিত্যাগ করা অসম্ভব।

"আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, তারা একটি সৎ কাজের সাথে আরেকটি মন্দ কাজকে মিশ্রিত করেছিলো। আশা করা যায় আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবুল করবেন।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:১০২)

নিজেকে ব্যক্তিপূজা থেকে মুক্ত ভেবে কেউ কেউ নিজের প্রবৃত্তির পূজা করে।

কেউ হয়তো মনে করছে সে ব্যক্তিপূজা থেকে মুক্ত, কিন্তু বাস্তবে হয়তো সে তার প্রবৃত্তির পূজা করে। সে আগেও দাস ছিলো, এখনো দাস হয়েছে। কেবল তার মনিব পরিবর্তিত হয়েছে।

মানুষ অনেক সময় প্রশংসা পাওয়ার লোভে সত্যের পক্ষে কথা বলে।

যে কেউ মানুষের প্রশংসা ভালোবাসে, সে মানুষকে খুশি করতেই সত্য প্রকাশ করে। আর মানুষ অসন্তুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকে।

মুনাফিকরা নিজেদেরকে ফিতনার বিরুদ্ধে সতর্ককারী হিসেবে জাহির করে, অথচ তারা নিজেরাই ফিতনায় পতিত আছে।

মুনাফিকরা তাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান নিয়ে নিজেদেরকে ফিতনার বিরুদ্ধে সতর্ককারী হিসেবে জাহির করে। অথচ এর চেয়ে বড় ফিতনায় তারা নিজেরাই পড়ে আছে।

"তাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বলে, 'আমাকে (জিহাদ থেকে অব্যাহতির) অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না।' নিঃসন্দেহে তারা ফিতনায়ই পড়ে আছে।" (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:৪৯)

কেউ কেউ তার মন্দ কাজটিকেই উত্তম মনে করে।

আল্লাহ কর্তৃক মানুষের উপর আরোপিত সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো মন্দকে তার নিকট এতই প্রিয় করে তোলা যে, সে পাগলের মতো একে ভালোবাসতে থাকে ও ছড়াতে থাকে। তারপর এমন অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

"তাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, ফলে সে সেটিকে উত্তম মনে করে।" (সূরাহ ফাতির ৩৫:৮)

যে চায় মানুষ তাকে ভয় করুক, সে অহংকারী।

নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে যে চায় যে মানুষ তাকে ভয় করুক, সে অহংকারী। ভয়ে কম্পমান এক লোককে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে আনা হলে তিনি তাকে বলেন, “শান্ত হও। আমি কোনো রাজা নই। আমি এক সাধারণ ব্যক্তি যার মা শুকনো মাংস আহার করতেন।” (ইবনু মাজাহ: ৩৩১২)

ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহানো লোক হলো তত্ত্ব কপচানো অকর্মারা।

সবচেয়ে দুর্বলচেতা লোক হলো তারা, যারা মুখে যা বলে সেটাকে কাজে রূপান্তরিত করে না। বলার ক্ষেত্রেও তারা বারবার কথা পাল্টায়। ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহানো লোক হলো তত্ত্ব কপচানো অকর্মারা।

মুনাফিকদের অন্তরের কুফর আল্লাহ ফাঁস করে দেবেন।

উম্মাহর বিপদের সময় ইয়াহুদী-নাসারাদের কথার সাথে সাথে মাথা ঝাঁকানো লোকেরা হলো মুনাফিক।

“যাদের অন্তরে রোগ আছে, তুমি তাদেরকে দেখবে যে তারা তাদের (ইয়াহুদী-নাসারা) কাছে দৌড়ে গিয়ে বলবে, ‘আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে না পড়ে যাই।’” (সূরাহ আল-মা’ইদাহ ৫:৫২)

মুনাফিকদের অন্তরে সত্যের প্রতি শত্রুতা আর মিথ্যার প্রতি ভালোবাসা লুকায়িত থাকে। আর এভাবে সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে আল্লাহ এগুলো ফাঁস করে দেন।

“যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা কি মনে করে যে,আল্লাহ তাদের অন্তরের লুকানো বিদ্বেষ কখনো প্রকাশ করে দিবেন না?” (সূরাহ মুহাম্মাদ ৪৭:২৯)

মুনাফিকরা নিজেদেরকে বিশাল জনগোষ্ঠী মনে করে।

মুনাফিকরা প্রায়ই যে ভুলটা করে তা হলো, নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহর অনুপাতে বিশাল জনগোষ্ঠী মনে করা।

“তারা বলে, ‘আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সম্মানিতরা (মুনাফিক্ব সর্দার ‘আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই) অবশ্যই হীনদেরকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখান থেকে বহিষ্কার করবে।’ সমস্ত মান-মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।” (সূরাহ আল-মুনাফিক্বুন ৬৩:৮)

অযোগ্য শাসকের বিজয়ে উল্লসিত হয় মুনাফিকরা।

অজ্ঞ আর মুনাফিক্ব ছাড়া কেউই যোগ্য শাসকের ওপর অযোগ্য শাসকের বিজয়ে উল্লসিত হয় না। নাজ্জাশী অন্যান্য শাসকের চেয়ে ভালো ছিলো, তার ইসলাম গ্রহণ করার আগেও সাহাবাগণ তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়ের জন্য দু'আ করেছেন আর তাঁর বিজয়ে উল্লসিত হয়েছেন।

নিজের স্বার্থের লোভে অনেকে মাজলুমকে ছেড়ে জালিমের পক্ষে দাঁড়ায়।

যালিমের যুলুমের মাধ্যমে যখন কারো স্বার্থসিদ্ধি হয় তখন সে যালিমের বিরোধিতা করার বদলে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং মাযলুমের ভুলত্রুটি অন্বেষণে লেগে যায়। আর জালিমের যুলুমের ব্যাপারে চুপ থাকে। কারো উপর জুলুম হলে তার পক্ষে দাঁড়াতে হয়। মাজলুমের চুলচেরা পরীক্ষা নিতে হয় না।

মুনাফিকরা উম্মাহর সবচেয়ে বড় শত্রু।

উম্মাহর সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু হলো এর ভেতরে থাকা মুনাফিকরা। আলেমরাই তাদের চিনতে ভুল করেন। তাহলে আমজনতার কী দশা হবে! আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেন,

"এরাই শত্রু, কাজেই তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। এদের উপর আল্লাহর গযব। তাদেরকে কীভাবে (সত্য পথ থেকে) ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে!"

(সূরাহ আল-মুনাফিক্বুন ৬৩:৪)

গুনাহের কারণে আলেম বাতিলের বিরুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ে।

বাতিলের মোকাবেলায় আলেমদেরকে একটা জিনিসই দুর্বল করে দিতে পারে। তা হলো গুনাহ। আলেম যখন গুনাহ করে এর দ্বারা তাদের হৃদয়ে সংশয় ও ইতস্তত ভাব সৃষ্টি হয়। এর ফলে তারা বাতিলের বিরুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়ে।

"দু'দল পরস্পর মুখোমুখি হওয়ার দিন তোমাদের মধ্যে যারা পলায়নপর হয়েছিলো, তোমাদের কোনো কোনো অতীত কার্যকলাপের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো।" (সূরাহ আলি 'ইমরান ৩:১৫৫)

যখন মুনাফিকদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকা হয় তারা এতে বিরক্ত হয়।

মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো তাদেরকে আল্লাহর আইনের দিকে ডাকা।

"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের এবং রাসূলের দিকে এসো,' তখন তুমি ওই মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।" (সূরাহ আন-নিসা ৪:৬১)

আল্লাহ বহিঃশত্রুদের দুর্বল করতে বলেছেন যাতে মুনাফিকরাও সে অনুযায়ী দুর্বল হয়ে যায়।

মুনাফিকরা দ্বীনকে ব্যবহার করে। কিন্তু তা দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার কারণে নয়, বরং একে ভেতর থেকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে।

“আর যারা মাসজিদ তৈরি করেছে ক্ষতিসাধন, কুফরি আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে, আর যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য, তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, ‘আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ব্যতীত কিছু নয়।’ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।” (সূরাহ আত-তাওবাহ ৯:১০৭)

আর এসব মুনাফিকরা শক্তি অর্জন করে বহিঃশত্রুর কাছ থেকে। তাই আল্লাহ বহিঃশত্রুদের দুর্বল করতে বলেছেন যাতে মুনাফিকরাও সে অনুযায়ী দুর্বল হয়ে যায়।

“যার দ্বারা তোমরা ভয় দেখাতে থাকবে আল্লাহর শত্রু আর তোমাদের শত্রুকে, আর তাদের ছাড়াও অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানোনা, কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:৬০)

অন্তর যদি স্থির থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অবিচল হয়।

আলেমের কথার মাঝে স্ববিরোধিতা ও বারবার অবস্থান পরিবর্তন হলো অন্তরের ইখলাসের অভাবের লক্ষণ। অন্তর যদি স্থির থাকে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গও অবিচল হয়।

নবীজীর অনুপস্থিতিতে মুনাফিকরা যে দু’টি জঘন্য কাজ করে বেড়াতো।

নবীজী ﷺ যখন বহিঃশত্রুর মোকাবেলায় ব্যস্ত থাকতেন, মুনাফিকরা তখন দুটি কাজ করার চেষ্টা করতো।

—তুচ্ছ বিষয়ে ফিতনা লাগিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মনোযোগ হটিয়ে দেওয়া।

—কামনা চরিতার্থ করতে নারীদের দ্বারস্থ হওয়া।

খাহেশাতের মদে মাতাল যারা।

খাহেশাত হলো অন্তরের মদ। এর ফলে অন্তর মাতাল হয়ে যায়, সত্যকে সে আর দেখতে পায় না। নানা মতবাদ আর মতাদর্শের আঁধারে সে তখন হাতড়ে মরে।

“সুতরাং যে ব্যক্তি কেয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধবংস হয়ে যাবে।”

(সূরাহ ত্বা-হা ২০:১৬)

দান করতে গিয়ে উসখুস করা মুনাফিকির লক্ষণ

সানন্দে দান করা ঈমানের লক্ষণ, আর দান করতে গিয়ে উসখুস করা মুনাফেকির লক্ষণ। আল্লাহ্‌ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন,
"আর দান করলেও তা করে অনিচ্ছা সহকারে।" (সূরাহ্‌ আত-তাওবাহ ৯:৫৪)

মধ্যমপন্থা মানে সত্য আর মিথ্যার মাঝামাঝি থেকে সবার প্রশংসা কুড়ানো নয়।

অনেকে ভাবে, মধ্যমপন্থা হলো সত্য ও মিথ্যার মাঝামাঝি স্থানে থেকে সবার প্রশংসা কুড়ানো।
"অচিরেই তোমরা কতক লোককে এমনও পাবে, যারা তোমাদের কাছ থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, তাদের নিজ সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদ থাকতে চায়, যখন তাদেরকে ফিতনার দিকে মনোনিবেশ করানো হয় তখন তাতেই জড়িয়ে পড়ে।"
(সূরাহ্‌ আন-নিসা ৪:৯১)

পাপাচারী ব্যক্তি সবাইকে নিজের মত পাপাচারী মনে করে।

মন্দকাজে বেশি লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি সবাইকেই নিজের মতো মনে করে। একটি সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে,

"যে কেউ বলে, 'মানুষজন তো ধ্বংস হয়ে গেছে!' সে নিজেই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত।" (সহিহ্‌ মুসলিম: ৬৮৫০)

অর্থাৎ সে নিজেই তাদের চেয়ে বেশি খারাপ।

যে দুটি কারণে মানুষ স্বৈরাচারী হয়ে উঠে।

মানুষ দুটি কারণে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে।

—যখন সে নিজের ক্ষমতা দেখে বিভ্রান্ত হয় আর অন্যদের দুর্বলভাবে।

"সে কি মনে করে যে তার উপর কেউ ক্ষমতাবান নেই?" (সূরাহ্‌ আল-বালাদ ৯০:৫)

—আর যখন সে জবাবদহিতা ও শাস্তি থেকে নিজেকে মুক্ত ভাবে।

"সে কি মনে করে যে কেউ তাকে দেখেনি?" (সূরাহ্‌ আল-বালাদ ৯০:৭)

যারা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে লেখে, মানুষ পাল্টালে তাদের লেখাও পাল্টে যায়।

যে লেখক মানুষের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী লেখে, মানুষ পাল্টালে তার লেখাও পাল্টে যায়। আর যে লেখক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য লেখে, সে অবিচল থাকে। কারণ আল্লাহ্‌ হলেন আল-হাক্ক (সত্য) এবং তিনি পরিবর্তিত হন না।

একজন মুনাফিক নিজেকে নিষ্পাপ দাবি করে।

একজন মুনাফিক গুনাহ্ করে নিজেকে নিষ্পাপ দাবি করে। আর একজন মু'মিন নিজের গুনাহ্ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবাহ্ করে।

"যে ব্যক্তি কোনো ত্রুটি কিংবা পাপ করে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয়, সে তো জ্বলন্ত অপবাদ এবং সুস্পষ্ট গুনাহ্ নিজের উপর চাপিয়ে নেয়।"

(সূরাহ্ আন নিসা ৪:১১২)

জালিম নিজের জুলুমকে জুলুম মনে করে না।

জালিম কখনো তার জুলুমের ভয়াবহতা বুঝতে পারে না। যার মুখটাই তেতো, সে তেতো জিনিসের তিক্ততা বুঝবে কী করে?

অহংকারী ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

অহংকারী ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ। কারণ সে এক মোহের মধ্যে থাকে। আর মোহ তো মিথ্যারই এক রূপ, তা কখনও বাস্তবে ধরা দেয় না।

"তাদের অন্তরে আছে কেবল অহংকার, কিন্তু তারা তা (অর্থাৎ প্রকৃত বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহর দয়া ছাড়া) কক্ষনো অর্জন করতে পারেনা।"

(সূরাহ্ গাফির ৪০:৫৬)

জ্ঞানবান মুনাফিকরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

নিকৃষ্টতম মানুষ তো তারাই যাদের কথাবার্তা সুন্দর, কিন্তু কাজকর্মে তারা কেবলই ফাসাদ সৃষ্টিতে উস্তাদ। উমার (রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু) বলেন, "আমার ভয় হয় জ্ঞানবান মুনাফিকদের নিয়ে, যারা জ্ঞানের কথা বলবে আর অন্যায় কর্মকাণ্ড করবে।"

বিপর্যয়ের সময় ছোটখাট মতপার্থক্য নিয়ে যারা পড়ে থাকে তারা হয় অজ্ঞ, নয়তো নফসের পূজারী।

যখন বড় কোন সমস্যা দেখা দেয়, তখন ছোটখাট মতপার্থক্য নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত দলগুলোর দায়িত্ব হলো ঐক্যবদ্ধ হওয়া। উম্মাহর এই বিপর্যয়ের সময় ছোটখাটো মতপার্থক্য নিয়ে পড়ে থাকতে পারে কেবল দুই শ্রেণীর মানুষ। একদল— যারা সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কেই অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। আরেক দল— যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে নফসের সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে।

সত্যের চেয়ে যখন ব্যক্তিই বেশি প্রিয় হয়ে উঠে।

পছন্দের ব্যক্তির ব্যাপারে অভিযোগ উঠলে মানুষ হাজারটা অজুহাত দাঁড় করায়। আর অপছন্দের ব্যক্তির ব্যাপারে অভিযোগ পেলেই সমালোচনায় হামলে পড়ে। ব্যক্তির চেয়ে সত্যকে বেশি ভালোবাসলে অজুহাতের পাল্লা দুদিকেই সমান থাকতো।

প্রাচুর্যের সময় মানুষ পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে।

দারিদ্র্যের চেয়ে প্রাচুর্যের সময়েই বরং অন্যায়-অপরাধ বেড়ে যায়। দারিদ্র্যের সময়ে মানুষ একে অপরকে দয়া করে আর প্রাচুর্যের সময়ে প্রতিযোগিতা করে।
"আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাহদের জন্য রিযিক পর্যাপ্ত করে দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই জমিনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করতো; কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে যতটুকু ইচ্ছে নাযিল করেন।" (সূরাহ আশ-শুরা ৪২:২৭)

পথভ্রষ্ট আলেম শুধু প্রকাশ্যে নয় গোপনেও ফিতনা ছড়িয়ে বেড়ায়।

দাজ্জালের চেয়ে ভয়ংকর ফিতনা হলো পথভ্রষ্ট আলেম। কারণ দাজ্জাল ফিতনা ছড়াবে শুধু প্রকাশ্যে। আর পথভ্রষ্ট আলেম শুধু প্রকাশ্যে নয় গোপনেও ফিতনা ছড়িয়ে বেড়ায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি আমার উম্মাহর জন্য দাজ্জালের চেয়েও বেশি ভয় করি পথভ্রষ্ট আলেমের।" (সিলসিলা সহিহাহ: ১৯৮৯)

মন্দলোকের স্বভাব হলো নিজে যে অপকর্ম করে, অন্যকে সেই কাজের জন্যই তিরস্কার করা।

সমাজের মন্দলোকেরা সৎলোকদের বিরুদ্ধে খারাপ কাজের অভিযোগ উত্থাপন করে, অথচ খারাপ কাজে তারাই লিপ্ত থাকে। ফির'আউন মূসাকে (আলাইহিসসালাম) জাদুকরের অপবাদ দেয়, তারপর নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে জাদু ব্যবহার করে। এর জন্য সে তার জাদুকর বাহিনীকেও একত্রিত করে।
"ফিরআউন বললো, 'সকল পারদর্শী জাদুকরদের আমার কাছে নিয়ে এসো।"
(সূরাহ ইউনুস ১০:৭৯)

মুনাফিকরা মুমিনদের ভেতরে চর লেলিয়ে দেয়।

মুনাফিকরা একা একা কোনো ষড়যন্ত্র আঁটতে পারে না। অবশ্যই ভেতরের কোনো শত্রু তাদের সাথে হাত মেলায়।
"তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তখন তাদের শারীরিক গঠন তোমাকে চমৎকৃত করে। আর যখন তারা কথা বলে, তখন তুমি তাদের কথা আগ্রহ ভরে শুনো। অথচ তারা দেয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠের মতো।" (সূরাহ আল-মুনাফিকুন ৬৩:৪)

কাছের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা সবচেয়ে ভয়াবহ কাজ।

কাছের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা দূরের শত্রুর উপর আক্রমণ করার চেয়েও গুরুতর। কারণ কাছের লোকেরা আপনার কাছ থেকে সহায়তা কামনা করে, আর শত্রু তো বিরোধিতাই প্রত্যাশা করবে। তাই যার যা প্রত্যাশা তার বিপরীত কিছু ঘটে গেলে সেটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তবে যারা হকের পথে লড়াই করে তারা এরকম বিশাসঘাতকতার আঘাত থেকে রক্ষা পাবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “আমার উম্মতদের মধ্যে এমন এক দল সবসময় থাকবে যারা সুস্পষ্টভাবে হকের উপর থাকবে, বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি সাধিত হবে না।” (সহিহ মুসলিম: ৫০৫৯)

যার অহংকার যত বেশি হয়, তার বোধশক্তিও সেই হারে লোপ পায়।

অহংকার হলো হৃদয়ের উপর পর্দাস্বরূপ। একজন দাম্ভিক কখনোই সত্যকে বুঝতে পারবে না যতক্ষণ না সে অহংকার ত্যাগ করছে। যার অহংকার যত বেশি হয়, তার বোধশক্তিও সেই হারে লোপ পায়।

“আল্লাহ এভাবে প্রত্যেক দাম্ভিক স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন।”

(সূরাহ গাফির ৪০:৩৫)

শাহওয়াতই পথভ্রষ্টতার মূল কারণ।

যখন শাহওয়াতের (লোভ-আকাঙ্ক্ষা) মৃত্যু ঘটে, তখন তার পিছে পিছে শুবহাতেরও একই পরিণতি হয়। এজন্যই যুবকেরা বৃদ্ধদের অপেক্ষা বিপথে যায় বেশি, কেননা বৃদ্ধদেরলোভলালসা কম। ফলে তারা শুবহাত দ্বারা কম আক্রান্ত হয়।

মুনাফিকরা আল্লাহ্র আইনকে ঘৃণা করে।

মুনাফিকদের লক্ষণগুলোর মধ্যে সব থেকে দৃশ্যমান লক্ষণ হলো, আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার-ফায়সালা থেকে পালিয়ে বেড়ানো এবং এর প্রতি ঘৃনা পোষণ করা।

“যখন তাদেরকে বলা হয়-তোমরা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন তুমি ঐ মুনাফিকদেরকে দেখবে, তারা তোমার থেকে ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।” (সূরাহ আন-নিসা ৪:৬১)

মুনাফিকদের দ্বিমুখীতা।

মুনাফিকেরা মদীনার যুবতী মেয়েদের তাড়া করতো এবং নারী দাসীদেরকে দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করাতো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের কারণে নারী দাসীদের উপার্জনকে নিষিদ্ধ করে দেন। আর এই মুনাফিকগুলোই যখন সাফওয়ানের সাথে ‘আয়িশাকে (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা) দেখলো, তখন তারাই কি না ইজ্জত-সম্মান আর শালীনতার কথা বলে মায়াকান্না করতে লাগলো!

অন্তরের রোগও ছোঁয়াচে।

শারীরিক রোগের মতোই অন্তরের রোগও ছোঁয়াচে। তাই এসব রোগীর সাথে চলাফেরা থেকে সাবধান।

"যখন তুমি দেখো আমার আয়াত নিয়ে তারা উপহাসপূর্ণ আলোচনা করছে, তখন তাদের থেকে সরে পড়ো যে পর্যন্ত তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়।"

(সূরাহ আল-আনআম ৬:৬৮)

যারা কুরআনের মুতাশাবিহাত আয়াত নিয়ে পড়ে থাকে তাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্থ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যখন তোমরা কাউকে কুরআনের মুতাশাবিহাত আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখবে, তখন বুঝবে যে এদের ব্যাপারেই আল্লাহ বলেছেন (যে, এরা সত্য থেকে বিচ্যুত)। অতএব, তাদের থেকে সাবধান।"

সবচেয়ে বড় অজ্ঞ হলো সে, যে নিজেকে সবজান্তা ভাবে।

যে অজ্ঞ জানে না যে সে অজ্ঞ, সে সবচেয়ে বড় অজ্ঞ নয়। সবচেয়ে বড় অজ্ঞ তো সে-ই, যে অজ্ঞ হয়েও নিজেকে সবজান্তা ভাবে।

দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো কাজ কম, কথা বেশি বলা।

মুনাফিকের শক্তি জিহ্বায়, আর মু'মিনের শক্তি অন্তরে। দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো কাজ কম, কথা বেশি বলা। আর দ্বীনে অবিচল লোকদের বৈশিষ্ট্য হলো কথা কম, কাজ বেশি করা।

পাপে আনন্দ বোধ করা ও তা প্রচার করে বেড়ানো হলো হীনতার পরিচয়।

পাপ করে ফেললে অনুশোচনা বোধ করাটাই সম্মানের কাজ। আর পাপে আনন্দ বোধ করা ও তা প্রচার করে বেড়ানো হলো হীনতার পরিচয়।

ইবলিস মানুষকে দীর্ঘ আশা আর নেতৃত্বের লোভ দেখায়।

ইবলিস মানুষকে যে বিষয়ে সবচেয়ে সহজে ধোঁকা দিতে পারে তা হলো দীর্ঘ আশা পোষণ করানো এবং নেতৃত্বের লোভ দেখানো:

"কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো, সে বললো, 'হে আদাম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা কোনোদিন ক্ষয় হবে না?'" (সূরাহ ত্বা-হা ২০:১২০)

অহংকারীর অন্তর ভ্রান্তিতে পূর্ণ থাকে, তাই সেখানে সত্য প্রবেশ করে না।

অহংকারীরা কথা শোনে কম। কারণ তাদের হৃদয় থাকে ভ্রান্তিতে টুইটুম্বর। যখন সত্য এতে প্রবেশ করতে চায়, তা উপচে পড়ে যায়।

"যারা অন্যায়ভাবে পৃথিবিতে অহংকার করে বেড়ায়, আমি শীঘ্রই তাদের দৃষ্টিকে আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেবো।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ ৭:১৪৬)

অনেকে মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে হক কথা বলতে চায় না।

বাতিলপন্থীরা নিন্দা করে মান-সম্মান কমিয়ে দেবে, এই ভয়েই অনেকে হককথা বলতে চায় না। অথচ আল্লাহ্ বলেন:

"ওদের কথা যেন আপনাকে দুঃখ না দেয়, যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহর জন্যই।"

(সূরাহ্ ইউনুস ১০:৬৫)

কুধারণার ফলে সমাজে অনাচার ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষের মাঝে বেশিরভাগ অনাচার ছড়িয়ে পড়ার কারণ হলো কুধারণা পোষণ করা। অপছন্দের ব্যক্তির বিরুদ্ধে মনে যখন কোনো খারাপ ধারণা চলে আসে,সেটাকেই সে নিশ্চিত সত্য বলে ধরে নেয়।

"বেশি বেশি ধারণা-অনুমান করা পরিহার করো। নিশ্চয়ই কিছুক্ষেত্রে অনুমান পাপ।"

(সূরাহ্ আল-হুজুরাত ৪৯:১২)

গুনাহের ফলে কুরআন বোঝার ক্ষমতা লোপ পায়।

গুনাহের কারণে কুরআন বোঝার ও এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা লোপ পায়।

"আমি চাইলে তাদেরকে তাদের পাপের কারণে শাস্তি দিতে পারি আর তাদের অন্তরে সীল লাগিয়ে দিতে পারি যাতে তারা কিছুই শুনবে না।" (সূরাহ্ আল-আ'রাফ ৭:১০০)

মুনাফিকরা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে নিরাপদ ভাবে।

মুনাফিকেরা এমনই ঘোরের মধ্যে থাকে যে তারা আল্লাহকেও ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী।

"নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে বিভ্রান্ত করতে চায়। অথচ আল্লাহ্ই তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন।" (সুরাহ আন-নিসা'৪:১৪২)

তাই আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিক থেকেই পাকড়াও করেন যেদিকটাকে তারা সবচেয়ে নিরাপদ বলে ভাবতো।

হিংসার প্রকাশ হয় অন্যের দোষ বলে বেড়ানোর মাধ্যমে।

হিংসার সবচেয়ে বড় প্রকাশ হলো নিজের দোষ ঢাকতে অন্যের দোষ বলে বেড়ানো। আর বিশুদ্ধতম হৃদয়ের অধিকারী তো তারাই, যারা নিজেরা ভুল করলেও অন্যের ভুল করা দেখে মনে মনে কষ্ট পায়।

নফস যেটা চায় সেটাকে সে ভালো প্রমাণ করেই ছাড়ে।

কুরআন এবং ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নফস যেটা চায় সেটাকে সে ভালো প্রমাণ করেই ছাড়ে। পূর্বেকার মূর্তিপূজারী, সাদ্দূমের সমকামী, অত্যাচারী ফির'আউন, সম্পদ আত্মসাৎকারী মাদইয়ানবাসী সবাইই নিজ নিজ খারাপ কাজের পক্ষে যুক্তি দিতো।

খারাপ মুখের ভাষা নিচু ঈমানের পরিচয় বহন করে।

মানুষের মুখের ভাষা যত খারাপ হয়,তার ঈমান তত কমে যায়। হাদীসে আছে,"মু'মিন কখনো অতিরিক্ত বিদ্রুপকারী, অভিসম্পাতকারী ও কটুভাষী হয় না।" (তিরমিযি: ১৯৭৭)

খাহেশাত মানুষকে সত্য থেকে ফিরিয়ে রাখে।

মানুষের হৃদয় যদি খাহেশাত দিয়ে কলুষিত না থাকতো, তাহলে সে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানের কোনোকিছুকেই অস্বীকার করতো না। তার হৃদয় তাকে পথ দেখাতে যায়। কিন্তু তার খাহেশাত তাকে পথভ্রষ্ট করে। শেষমেশ খাহেশাতকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে সুস্পষ্ট সত্যের ব্যাপারে কুফরি করে বসে:

"নিশ্চয় মানুষ চরম অকৃতজ্ঞ।" (সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:১৫)

মানুষের ধ্বংসের একটি চিহ্ন হলো সে উপদেশ শুনতে শুনতে নিজেকে বিরক্ত মনে করে।

মানুষের ধ্বংসের একটি চিহ্ন হলো সে উপদেশ শুনতে শুনতে নিজেকে বিরক্ত মনে করে। কিন্তু নিজের হাজারো ভুলগুলো তার চোখে পড়ে না। ফলে নিজেকে সংশোধন না করে গোঁয়ারের মতো ভুলগুলো করেই চলে।

চিন্তার স্বাধীনতা নয়, নফসের শিকল

ব্যক্তি স্বাধীনতা আজকের বহুল ব্যবহৃত শব্দ। এই স্বাধীনতার নাম দিয়ে পশ্চিমা অনাচার পাপাচারের বিষ বাষ্প আজ ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম দেশগুলোতেও। ফলশ্রুতিতে সমকামিতা, ব্যভিচার, ফেমিনিজম, নাস্তিকতা, ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে সন্দেহ আজ আমাদের প্রজন্মকে গিলে খাচ্ছে। চিন্তার স্বাধীনতার নামে নিজেদের নফসের শেকলে বন্দী হওয়া এই আমাদের জন্য এই অধ্যায়ে শাইখের মূল্যবান কিছু বক্তব্য সাজানো হয়েছে, যেখানে নফসের পূজারীদের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি আছে এই ভয়াবহ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের নানান দিক নির্দেশনা।

লূতের জাতি তাদের বিকৃতিকে বিবাহের মাধ্যমে উদযাপন করতো না, আজকের পশ্চিমা সমাজ যেমনটা করে।

মানুষ, এমনকি পশুদেরও ফিতরাতের বিপরীতে গিয়ে পশ্চিমারা সমকামী বিয়েকে বৈধ করেছে। তাদের বিকৃতি লূতের ('আলাইহিসসালাম) ক্বওমের বিকৃতির চেয়েও জঘন্য। কারণ লূতের জাতি তাদের বিকৃতিকে বিবাহের মাধ্যমে উদযাপন করতো না।

সমকামীদের কোনটি নারী আর কোনটি পুরুষ সেটা না বলে পশ্চিমারা আমাদেরকে নারী অধিকারে বিশ্বাস করতে বলে।

পশ্চিমা বিশ্ব সমকামী বিবাহকে বৈধতা দেয় ও একে স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করে। তারাই আবার মুসলিমদেরকে নারী-অধিকারে বিশ্বাস করতে বলে, অথচ দুই সমকামীর মধ্যে কোনটা নারী তা বলে দেয় না।

দ্বীন ইসলাম ও ফিতরাত উভয়েই লিবারেলিজমের বিরোধী

লিবারেলিজমের প্রবক্তারা শর্তহীনভাবে এই মতবাদকে চালু করেছিলো। তারপর তারা একে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তারা এই মতবাদের অগ্রগতির জন্য রাস্তা সাফ করতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, যেই বাধাগুলো সরানো সম্ভব না সেগুলোকেও উপড়ে ফেলতে চাইছে। তাই তারা দ্বীন ইসলাম ও ফিতরাতের (স্বাভাবিক প্রবণতা) পাহাড়সম বাধাকেও সরানোর চেষ্টা করছে।

তারা নারীদেরকে 'সমাজের অর্ধেক' বলে নাম দিয়েছে যাতে একই কাজ সবারই করা লাগে।

তারা ভাষার প্রয়োগ নিয়ে অত্যন্ত সাবধানী! তারা নারীদেরকে 'সমাজের অর্ধেক' বলে নাম দিয়েছে যাতে একই কাজ সবারই করা লাগে। অথচ বাস্তবে সমাজ এরকম দ্বিখণ্ডিত নয়। এর পুরোটা জুড়েই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে প্রতিস্থাপন করতে থাকে। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জায়গায় থেকে তাদের করার মত কাজ আছে। এক পক্ষ একটা কাজ করলে অপর পক্ষের আর সেটা করা লাগে না। তাই সমাজে নারী পুরুষ একে অপরের সহযোগী, এদেরকে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করার প্রয়োজন নেই।

যাদের আকাশ সর্বদাই বৃষ্টি ঝরায় তারা পানি চুরি করতে যাবে কেন?

অনেকে নাক সিটকে বলে, 'আপনারা যে বলেন পশ্চিমা দেশগুলোতে শুধু নগ্নতা আর যৌনাচার। কিন্তু নগ্নতা ও অবাধ মেলামেশা সত্ত্বেও পশ্চিমা বিশ্বে যৌন-হয়রানির ঘটনা তো তেমন পাওয়াই যায় না!'

আমরা বলি, কারণ তারা তো ব্যভিচারকে বৈধই করে রেখেছে। লক্ষ্যকে তারা এতটাই কাছে এনে দিয়েছে যে সে পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের আর কোন পথ পাড়ি দিতে হয় না। যাদের আকাশ সর্বদাই বৃষ্টি ঝরায় তারা পানি চুরি করতে যাবে কেন?

নারী-পুরুষ আলাদা স্বত্বা, এদের মাঝে তুলনা চলে না।

"হে মারইয়াম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে বেছে নিয়েছেন ও পবিত্র করেছেন এবং তোমাকে তামাম দুনিয়ার নারীদের ওপর মনোনীত করেছেন।" (সূরাহ আলে 'ইমরান ৩:৪২)

আল্লাহ মারইয়ামকে (আলাইহিসসালাম) অন্য নারীদের সাথে তুলনা করেছেন। পুরুষদের প্রসঙ্গই আনেননি। কারণ নারী-পুরুষ আলাদা স্বত্বা। এদের মাঝে তুলনা চলে না।

খাহেশাতই সকল দাসত্বের মূল

অনেকে মনে করে স্বাধীনতা হলো মানুষের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পাওয়া। অথচ তারা ঠিকই খাহেশাতের দাস হয়ে থাকে। সকল দাসত্বের মূলে তো এই খাহেশাত। এটা যেন সেই ব্যক্তির মত যে হাতের শিকল খুলে গলায় বাঁধে, কারণ হাততালি দিতে পারাকেই সে স্বাধীনতা ভাবে।

আল্লাহ যেটাকে একজন নবীর জন্য শাস্তি বানালেন আধুনিক সমাজ সেটাকে ভাবে প্রগতি।

আল্লাহ জান্নাতে আদাম ও হাওয়া (আলাইহুমাসসালাম)-কে শাস্তি দিয়েছিলেন তাঁদের দেহ অনাবৃত করে ফেলার মাধ্যমে।

"অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষের স্বাদ গ্রহণ করলো, তাদের লজ্জাস্থানগুলো তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেলো।" (সূরাহ আল-আ'রাফ ৭:২২)

আল্লাহ যেটাকে একজন নবীর জন্য শাস্তি বানালেন, আধুনিক সমাজ সেটাকে ভাবে প্রগতি।

কেউ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা পুরনো আর কেউ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা নতুন।

নফসের পূজারীরা যেকোনো অজুহাতেই হোক, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করবেই। কেউ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা পুরনো।

"এগুলো তো আদিকালের উপকথা মাত্র!" (সূরাহ আল-মু'মিনুন ২৩:৮৩)

আর কেউ প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা নতুন।

"আমাদের বাপ-দাদাদের নিকট তো এরকম কিছু শুনিনি!" (সূরাহ আল-মু'মিনুন ২৩:২৪)

পশ্চিমা বিশ্ব মানুষকে যতটা মানবাধিকার দিয়েছে, ইসলামে পশুপাখির অধিকার তার চেয়েও বেশি।

পশ্চিমা বিশ্ব মানুষকে যতটা মানবাধিকার দিয়েছে, ইসলাম পশুপাখিকে তারচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে। কিন্তু ন্যায়বিচারের অভাবে আজ প্রাচ্যে ইসলামকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অন্যদিকে পশ্চিমে মানুষ আর পশুকে এক করে ফেলা হচ্ছে।

স্বাধীনতা তো মুক্ত স্থানে বসবাসের মধ্যেই নিহিত, কয়েকটি পদাঙ্কের গণ্ডিতে নয়।

তারা বলে আল্লাহ হারাম আরোপের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা বলে কিছু রাখেনি। অথচ আল্লাহ পুরো ভূমণ্ডলের মাইলের পর মাইলকে হালাল করেছেন আর এর অল্প কিছু পদাঙ্ককে করেছেন হারাম।

"ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে হালাল ও উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না।" (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:১৬৮)

সত্যিই যদি তোমরা স্বাধীনতা খোঁজো তবে স্বাধীনতা তো মুক্ত স্থানে বসবাসের মধ্যেই নিহিত, কয়েকটি পদাঙ্কের গণ্ডিতে নয়।

তারা ইসলামের উদারতার কথা বলেন, সত্য মিথ্যার লড়াইয়ের ঘটনাগুলো চেপে যান।

ইসলামের মান-ইজ্জত রক্ষার নাম করে অনেক লেখক ইসলামের উদারতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে লেখালেখি করেন। আর সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ের ঘটনাগুলো বেমালুম চেপে যান। এর ফলে সহনশীলতার নাম দিয়ে পরাজিত মানসিকতা সম্পন্ন একটি প্রজন্ম গড়ে ওঠছে।

মনের দূরত্ব থাকলে মানুষ অন্যের যুক্তি বুঝতে পারবে না।

দেহের মাঝে যেমন দূরত্ব থাকে, মনের মাঝেও তেমনি দূরত্ব থাকে। দূরের ব্যক্তির কথা শোনা যায়না। আপনার সাথে যার মনের দূরত্ব বিদ্যমান সে আপনার যুক্তি বুঝতে পারবেনা। মনের মিল থাকলে কারো কাছে সহজেই দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো যায়। যেমন ধরুন, ব্যভিচারকে যে হালাল মনে করে তার সামনে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কুফল বর্ণনা করে তো লাভ নেই! প্রথমে দু'জনকে এই বিষয়ে একমত হতে হবে যে, ব্যভিচার হারাম।

খাহেশাতের অনুসারীরা কুফরকে সহযোগিতা করে, আবার অন্যদিকে বিদ'আতের বিরোধিতা করে।

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষকে দেখবেন যারা বিদ'আতের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার। কিন্তু চারপাশের কুফরের ব্যাপারে একেবারে চুপ, ক্ষেত্র বিশেষে তারা কুফরকে সহযোগিতাও করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের খাহেশাতের অনুসরণ।

লিবারেলিজম বিদ'আতি ফিরকাগুলোর চেয়েও ভয়ংকর।

রাসূল ﷺ একবার সিরাত্বল মুস্তাক্বীম বোঝানোর জন্য মাটিতে একটি সরলরেখা আঁকলেন। তারপর শয়তানের রাস্তা বোঝাতে এর ডানে-বামে কয়েকটি বক্ররেখা আঁকলেন। এর মধ্যে কোনো রেখাই লিবারেলিজমের প্রতীক নয়। কারণ বক্ররেখাগুলো বিদ'আতি ফিরকাগুলোর প্রতীক। লিবারেলিজম হলো এইসব রেখারও বিপরীত একটি রেখা।

মানুষ তার খেয়াল-খুশির পূজা করে।

মানুষ তার নিজের ভেতরে এক মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, যাকে সে রুকু-সেজদা করে। সেই মূর্তি হলো তার হাওয়া (খেয়াল-খুশি, খাহেশাত)।

"তুমি কি লক্ষ করেছো তার প্রতি যে তার খেয়াল-খুশিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন।" (সূরাহ আল-জাসিয়া ৪৫:২৩)

জাহিলি যুগের লোকেরা যেভাবে তাদের উযযা দেবীর মূর্তিকে সেজদা করতো, এরাও সেভাবেই তাদের খাহেশাতকে সেজদা করে।

হিজাবের ফরযিয়তকে অস্বীকার করা কুফরি

সাধারণভাবে হিজাবের বিধান স্পষ্ট এবং সুবিদিত। কেউ যদি বলে যে হিজাব হলো অমুক দেশের কালচার, নারীরা যতটুকু ইচ্ছে ঢাকতে পারে-তাহলে সে কুফরি করেছে। এ নিয়ে কোনো মাযহাবে কোনো দ্বিমত নেই, এমনকি বিদ'আতি ফিরকাগুলো পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন দ্বিমত করেনি।

আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন ওয়াহী দিয়ে পথ চলার জন্য, এর সাথে মুখোমুখি সংঘাতে জড়ানোর জন্য নয়।

জ্ঞানবুদ্ধি যদি চোখ হয়, ওয়াহী হলো আলো। চোখ সরাসরি আলোর দিকে তাকালে জ্বলে যায়। আর সেই আলো যদি পথের উপর ফেলে, তাহলে পথ খুঁজে পায়। জ্ঞানবুদ্ধির সাথে ওয়াহীর সম্পর্ক এমনই। একে সৃষ্টি করা হয়েছে ওয়াহী দিয়ে পথ চলার জন্য, এর সাথে মুখোমুখি সংঘাতে জড়ানোর জন্য নয়।

যার সৃষ্টিই হয়েছে তার অনুমতি ছাড়া সে তার স্রষ্টাকে কী করে নিজের মতামতের অধীন ভাবে?

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার অনুমতি নেননি। যার অস্তিত্বই তার অনুমতি ছাড়া হয়েছে, সে কী করে আল্লাহর হুকুম ও হিকমাহকে নিজের অনুমতির অধীন করার সাহস দেখায়?

ওয়াহীর জ্ঞান ত্যাগ করে জ্ঞানবুদ্ধিতে সমাধান খুঁজতে গিয়েই সবচেয়ে বড় ফিতনার জন্ম হয়।

আজকের মতাদর্শগত ফিতনা আর কুরাইশদের মূর্তিপূজার ফিতনা একইরকম। উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াহীর জ্ঞান ত্যাগ করে মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধিতে সমাধান খোঁজা হয়। আবু রাজা’ বলেন, “আমরা কোনো একটি মূর্তিকে পূজা করতাম। তারপর এর চেয়ে ভালো মূর্তি খুঁজে পেলে আগেরটাকে ছুঁড়ে ফেলতাম।”

স্বাধীনতার লাগাম খোদ এর প্রবক্তাদের হাতেই নেই।

আজকাল বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হলো ‘স্বাধীনতা’। যারা এর প্রবক্তাতা তারা এর প্রয়োগ শুরু করতে জানে, কিন্তু এটি তাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে সেটা ঠাওর করতে পারে না। পশ্চিমারা অবাধ স্বাধীনতার কথা বলে এখন সমলিঙ্গের বিয়েকে বৈধতা দিয়েছে। তাদের এই স্বাধীনতার লাগাম যে আযাবে গিয়ে ঠেকবে সে বিষয়ে তাদের কোন ধারণাই নেই।

মধ্যমপন্থা আল্লাহর রাসূল দেখিয়ে গেছেন, নিজে নিজে বের করার দরকার নেই।

মধ্যমপন্থা কোনটি, তা রা সূল ﷺ নিজে দেখিয়ে গেছেন এবং আমাদেরকে সে পথে চলতে বলেছেন। নিজে নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে মধ্যমপন্থা আবিষ্কার করতে বলেননি।

“আর এটাই আমার সঠিক সরল পথ, কাজেই তোমরা তার অনুসরণ করো, আর নানান পথের অনুসরণ কোরো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।” (সূরাহ আল-আন‘আম ৬:১৫৩)

প্রবৃত্তিপূজারীরা মতপার্থক্যের মাঝে নিজের নফসের খোরাক খোঁজে

কাউকে যদি আলেমদের মধ্যকার মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন, যেটাকেই হালাল করার সুযোগ আছে সেটাকেই 'সত্য খোঁজা'র নাম দিয়ে হালাল করতে দেখেন, কিন্তু অকাট্যভাবে হারাম বিষয়গুলোতে নির্দ্বিধায় জড়িয়ে পড়তে দেখেন, তাহলে বুঝবেন সে সত্য খুঁজতে আসেনি, নফসের সন্তুষ্টি খুঁজতে এসেছে।

প্রকাশ্যে পাপকাজ করার নাম ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়।

প্রকাশ্যে পাপকাজ করার নাম ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়। উম্মাহ একটি জাহাজের মতো। কোনো পাপাচারী এসে জাহাজ ফুটো করে দিয়ে সবাইকে ডোবানোর চেয়ে তার একাকী সাগরে ঝাঁপ মারাটাই কম ক্ষতিকর। গোপনে কবিরা গুনাহ করার চেয়ে প্রকাশ্যে সগিরা গুনাহ করা আরো বেশি ভয়ঙ্কর।

সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো সত্যকে দেখতে পাওয়ার পরও তা থেকে পালিয়ে বেড়ানো।

অনেকে ভাবে কেবল অর্থ ও সন্তানাদি হারানোর মাধ্যমেই আল্লাহর শাস্তি আসে। আসলে তো সবচেয়ে বড় শাস্তি হলো সত্যকে দেখতে পাওয়ার পরও তা থেকে পালিয়ে বেড়ানো।

নাস্তিকতার মূল হলো বস্তুগত চাকচিক্যের প্রতি অন্ধ মুগ্ধতা।

নাস্তিকতার মূল হলো দুনিয়ার বস্তুগত চাকচিক্যের প্রতি অন্ধ মুগ্ধতা। সূরা কাহফে সেই বাগান মালিক তার বাগানের ফলের গাছ, ফল ফলাদি, আর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বহমান পানির স্রোতধারা দেখে অহংকারী হয়ে উঠেছিলো। দুনিয়ার চাকচিক্যের প্রতি অন্ধ মুগ্ধতা একসময় তাকে কুফরের অন্ধ গহ্বরে নিমজ্জিত করলো।

"(অহংকার ও কুফরের মাধ্যমে) নিজের প্রতি যুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, 'আমি মনে করি না এসব কখনো ধ্বংস হবে। আর আমি মনে করি কখনো ক্বিয়ামাত ঘটবে না"। (সূরাহ আল-কাহফ ১৮:৩৫-৩৬)

মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনুমোদন করে আর নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দমন করে।

কী অদ্ভুত! কিছু শাসক মানুষকে নিজ নিজ পছন্দমতো দেবদেবী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয়, অথচ তাকে ছাড়া অন্য কোনো শাসককে বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেয় না। সে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনুমোদন করে আর নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দমন করে।

নিজেদের ক্ষুদ্রে জ্ঞানে মানুষ ওয়াহীর জ্ঞানকে উপেক্ষা করে।

পার্থিব জগতকে মানুষ দেখতে পায়, শুনতেও পায়। তা সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র জগতে মানুষের পার্থিব জ্ঞানবুদ্ধি কখনো কখনো পথ হারিয়ে ফেলে। আর সেই মানুষই কিনা ওয়াহীর জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এমন অদৃশ্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে চায় যে বিষয়ে তার নূন্যতম কোন জ্ঞান নেই।

লিবারেলিজমের শুরু নফসের অনুসরণে,মাঝপথে থাকে কুফর, আর শেষে নাস্তিকতা।

লিবারেলিজমের শুরুটা হয় অসার খেয়াল-খুশি আর অনৈতিকতার মাধ্যমে, মাঝপথে থাকে কুফর, আর শেষে নাস্তিকতা। অসুস্থ চিন্তাধারার মানুষের পরিণতি আসলে এরকমই হবে।

জ্ঞানবুদ্ধিকে খেয়াল খুশি ও খাহেশাত থেকে মুক্ত রাখা চাই।

জ্ঞানবুদ্ধি হলো দাঁড়িপাল্লা। এটি একদিকে ঝুঁকিয়ে রেখে ওজন মাপলে সঠিক ফলাফল আসবে না। খেয়াল-খুশি ও খাহেশাতের ত্রুটি থেকে মুক্ত করে প্রথমে একে নিরপেক্ষ করতে হবে, তবেই সঠিক মাপ পাওয়া যাবে।

মনের বন্দিত্বই বড় বন্দিত্ব

আসল বন্দিত্ব তো অন্তরের বন্দিত্ব। কেউ মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়িয়ে আত্মহত্যা করে। আর কেউ কারাগারে বসেও হাস্যোজ্জ্বল থাকে।

শুবুহাত (সন্দেহ) অবস্থান করে শাহাওয়াতের সাথেই।

বেশিরভাগ নাস্তিকই নাস্তিক হয়েছে মনভর্তি নোংরা শাহাওয়াত (কু-বাসনা) ও দেহভর্তি সুস্থতা থাকা অবস্থায়। নিয়ন্ত্রিত কামনা-বাসনা আর চিন্তার সুস্থতা নিয়ে নাস্তিক হয়েছে- এরকম মানুষ বিরল। কারণ শুবুহাত (সন্দেহ) অবস্থান করে শাহাওয়াতের সাথেই। যাদের চিন্তার জগত কলুষিত হয় তাদের হৃদয়ে স্রষ্টার বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে।

মুক্তির একমাত্র উপায় হলো আল্লাহ্‌র হুকুমের সামনে মাথা নত করা।

কোনো জাতিই বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাবে না যদি না তারা আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে এবং শাসক ও জনগণের খেয়াল-খুশির অনুসরণ পরিত্যাগ করে।

“কাজেই যারা তার (নবীর) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর ফিতনা নেমে আসবে।” (সূরাহ আন-নূর ২৪:৬৩)

সংশয় থেকে মিথ্যার জন্ম

সকল মিথ্যাকেই পথ করে দেয় কোনো না কোনো সংশয়। এমনকি ইবলিসও তার অবাধ্যতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উত্থাপনের চেষ্টা করেছে।

“ইবলিস ছাড়া সবাই তাকে (আদাম আলাইহিসসালাম-কে) সাজদাহ করলো। সে (ইবলিস) বলেছিলো, ‘আমি কি তাকে সাজদাহ করবো যাকে তুমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো?” (সূরাহ বানু ইসরাঈল ১৭:৬১)

খাহেশাতের অনুসরণকারী যুক্তি মানে না।

খাহেশাতের অনুসরণকারীকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়েও কোনো কিছু বোঝাতে পারবেন না। প্রত্যেক যুগেই এই খেয়াল খুশির অনুসরণকারীরা আল্লাহর নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছে, কারণ তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছে সেটা তাদের নফসের সাথে যুতসই হচ্ছিলো না।

“অতঃপর যখনই কোনো রাসূল এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপুত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছো এবং কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করেছো ও কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছো।” (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:৮৭)

মানুষ স্বাধীনতার শুরু কোথায় তা বোঝে, কিন্তু শেষ কোথায় সেটা বোঝে না।

মানুষের স্বাধীনতার সীমা কোথায় গিয়ে শেষ হয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোথা থেকে শুরু হবে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেননি। কারণ, মানুষ বোঝে কোথা থেকে তার স্বাধীনতা শুরু। কিন্তু কোথায় গিয়ে তা শেষ হবে, এই বিষয়েই যত গণ্ডগোল বাঁধিয়ে বসে।

কিছু মানুষ সত্য খুঁজতে গিয়ে মিথ্যা শিখে ফেলে।

কিছু মানুষ সত্যকে বোঝার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তার চেয়ে ভয়াবহ হলো সত্যকে খুঁজতে গিয়ে মিথ্যে শিখে ফেলা। এর কারণ এসব মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য সব উৎস থেকে সত্য খোঁজার চেষ্টা করে। ফলে তাদের হৃদয়ের মাঝে সত্য প্রবেশ করতে পারে না।

“আর জেনে রেখো যে, মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হয়ে যান।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:২৪)

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আনুগত্যের জন্য। কাজেই সে যেন নিজের মনিবকে বেছে নেয়।

আপনার কোনো দরকারি জিনিস থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তখন সেই জিনিস আদায় করতে যাওয়াটা আপনার স্বাধীনতা। আগ বাড়িয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস হাসিল করার চেষ্টাকে স্বাধীনতা বলেনা। আল্লাহর একটা হুকুমের আনুগত্য থেকে নিজেকে স্বাধীন করে নেওয়ার অর্থ হলো শয়তানের আনুগত্যে বন্দী হওয়া। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আনুগত্যের জন্য। কাজেই সে যেন নিজের মনিবকে বেছে নেয়।

সুদৃঢ় থাকতে হবে আল্লাহর আদিষ্ট পথে, নিজের মনগড়া পথে না।

আল্লাহ তাঁর নবীকে ﷺ বলেন,

"সুদৃঢ় হয়ে থাকো যেভাবে আল্লাহ তোমাকে আদেশ করেছেন।"
(সূরাহ হুদ ১১:১১২)

সুদৃঢ় থাকতে হবে আল্লাহর আদিষ্ট পথে, নিজের মনগড়া পথে না, এমনকি নিজে নবী হলেও না। কোনো মানুষের মনগড়া পথ যদি আদৌ সঠিক হতো, তাহলে তার সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন রাসূল ﷺ স্বয়ং। তাহলে কী করে আমরা আমাদের মনগড়া পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি?

পশ্চিমা লিবারেলিজম হলো রোগাক্রান্ত গর্ভ।

পশ্চিমা লিবারেলিজম সম্পর্কে যার জ্ঞান আছে, তার বোঝা উচিত যে এটি একটি রোগাক্রান্ত গর্ভ। প্রাচ্যের কোনো ব্যক্তি এখান থেকে সন্তান আকারে বের হলে সে বিকলাঙ্গ বা মৃত হয়ে বের হবে।

সত্যিকারের ন্যায়বিচার হলো আল্লাহর আইনের শাসন।

পশ্চিমা বিশ্ব দেখাতে চায় যে গণতন্ত্র আর একনায়কতন্ত্রের মাঝামাঝি কিছু নেই। অথচ জনগণের অবাধ স্বাধীনতা ও স্বৈরশাসকের চরম কঠোরতার মাঝে সত্যিকারের ন্যায়বিচার হলো আল্লাহর আইনের শাসন।

কুরআন-হাদীসের সাথে মূল দ্বন্দ্ব নিজের খেয়াল-খুশির।

বুদ্ধি-বিবেচনা (‘আক্বল) আর কুরআন-হাদীসের (নাক্বল) মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্ব হলো কুরআন-হাদীসের সাথে খেয়াল-খুশির। এই খেয়াল-খুশিই বুদ্ধি-বিবেচনাকে গ্রাস করে ফেলে। আর একসময় সেই খেয়াল-খুশিই মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনার জায়গা দখল করে সিদ্ধান্ত দিতে থাকে।

নফসের সাথে মিলে গেলে অনুমানই শক্ত প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

কারো অনুমান যখন তার নফসের খেয়াল-খুশির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তখন সেই অনুমানকেই সে নিশ্চিত জ্ঞান বলে মনে করে।

“তারা কেবল অনুমান ও খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।”
(সূরাহ আন-নাজম ৫৩:২৩)

মূল্যবান উপদেশ

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে' (সূরাহ নাহল ১৬:৪৩)

চলার পথে, নানান ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের জরুরী দিক নির্দেশনার প্রয়োজন পড়ে। বর্তমান সময়ে কাউন্সেলিং কিংবা মোটিভেশনাল স্পিচের যেখানে জয়জয়কার তখন যান্ত্রিক আটপৌরে জীবনের বাঁকে বাঁকে আধুনিক নানান যুগ জিজ্ঞাসা আর সময়ের আবর্তনের সাথে পরিচিতি এমন একজন আলেমকেও দরকার যিনি আমাদের চাহিদামাফিক দ্বীনের ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য উপদেশমালা নিয়ে হাজির হবেন। যিনি আমাদেরকে গাইড করবেন, ভুলটা দেখিয়ে দিবেন, শোধরে দিবেন। আমাদের এই বইয়ের লেখক শাইখ আবদুল আযীয আত-তারিফী আমাদের সেরকমই একজন অভিভাবক।

এই অধ্যায়ে আমরা শাইখের এমন সব জরুরী, মনজুড়ানো উপদেশমালা নিয়ে হাজির হয়েছি। কখনো শাসনে, কখনো ভালোবাসায়, কখনো সমালোচনার ঢঙে শাইখের উপদেশগুলো পাঠককে উপকৃত করবেই, এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

কুকুরের কাছ থেকে আপনি বিশ্বস্ততা শিখতে পারেন, ঘেউ ঘেউ করা না।

অনেকেই পশ্চিমাদের আধুনিক প্রযুক্তি আর নানান বস্তুবাদী জীবন উপকরণ দেখে মুগ্ধ হয়। নিজেদেরকে পশ্চিমা আধুনিকায়নের প্রক্রিয়ায় নিতে গিয়ে একসময় তারা দ্বীন ইসলামকেও তাদের মত করে বানিয়ে নিতে চায়। তবে কলকারখানার পশ্চিমাকরণ আর দ্বীন ও নৈতিকতার পশ্চিমাকরণের পার্থক্য বুঝতে হবে। বুদ্ধিমান লোক তো পশুপাখির কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু কুকুরের কাছ থেকে আপনি বিশ্বস্ততা শিখতে পারেন, ঘেউ ঘেউ করা না। ঈগলের কাছে আকাশযানের মূলনীতি শিখতে পারেন, লাশ ভক্ষণ না।

সামনাসামনি কারো প্রশংসা করা তার গলা কেটে দেওয়ার মত ভয়ঙ্কর।

সামনাসামনি কাউকে প্রশংসা করা খুবই ক্ষতিকর। এর ফলে তাকে অতি-আত্মবিশ্বাসী করে তোলা হয়। এতে সে সীমালঙ্ঘন করে এমন সব কাজ করতে শুরু করে যেগুলোর যোগ্য সে নয়। এভাবে সে নিজের উপরও যুলুম করে, অন্যদের উপরও যুলুম করে। নবীজীর ﷺ সামনে একজন আরেকজনকে প্রশংসা করলে তিনি প্রশংসাকারীকে বলেন, “তুমি তো তোমার সঙ্গীর গলা কেটে দিলে।”

(বুখারি: ২৫১৯, মুসলিম: ৭৬৯৩)

আর সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো শাসকের প্রশংসা করা। সাধারণ মানুষের প্রশংসা করা মানে তার গলা কেটে ফেলা। আর শাসকের প্রশংসা করা মানে উম্মাহর গলা কেটে ফেলা। কারণ এর ফলে শাসক অহংকারী হয়ে ওঠে, নসিহত শুনতে চায় না এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে অবিচার করে।

তোতাপাখির গল্প।

কিছু লোককে তোতাপাখি হিসেবে ভাড়া করা হয়, সে কোনো চিন্তাশীলতার জন্ম দেয় না। আর না সে কোনো জাতিকে রক্ষা করতে পারে, না বিশ্বস্ত হতে পারে, না শত্রুকে ভয় দেখাতে পারে। সে কর্তৃপক্ষের ভয়ে বা তাদের অনুগ্রহের লোভে তাদের বুলি আওড়ায়। আর নিজের স্বার্থ হাসিল হয়ে গেলে গা ঢাকা দেয়। সবার সাথে আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু এসকল তোতাপাখির সাথে আলোচনা চলতে পারে না। সে যা বলে, তা তার নিজের কথা নয়। সে কিছু শেখানো কথা আওড়িয়ে যায়, প্রশ্ন করলে সে জবাব দিতে পারে না।

যদি অপছন্দের জায়গাটা অপছন্দের জায়গাতেই রেখে, কারো ভালো দিকগুলোও দেখেন তাহলে উভয়ের মাঝে ইনসাফ করতে পারবেন।

নফস যখন কোনো কিছুকে ভালোবাসে, তখন তার কোনও দোষ চোখে পড়ে না। আবার যখন সে কোনো কিছুকে ঘৃণা করে, তখন তার ভালো গুণগুলোও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

নবীজী ﷺ বলেন, “মু’মিনের উচিত না মু’মিনাকে (তার স্ত্রীকে) ঘৃণা করা। সে যদি তার কোনো একটি বৈশিষ্ট্য অপছন্দ করে, তাহলে অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য তার পছন্দ হবে’। (সহিহ মুসলিম: ১৪৬৯)

যদি আপনি আপনার স্ত্রীর কোনো একটি বৈশিষ্ট্য অপছন্দ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই তার অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে যা আপনার পছন্দ হবে। তাই স্ত্রীকে একচোখে দেখবেন না, দুই চোখ দিয়েই দেখুন। যদি শুধু অপছন্দের দিকটাতেই বেশি গুরুত্ব দেন আপনি তাকে ভালোবাসতে পারবেন না। কিন্তু যদি অপছন্দের জায়গাটা অপছন্দের জায়গাতেই রেখে, তার ভালো দিকগুলোও দেখেন তাহলে উভয়ের মাঝে ব্যাল্যান্স করতে পারবেন। ইনসাফ করতে পারবেন।

আমরা পালা-পার্বণের জাতি নই, আমরা কাজ করনেওয়ালা জাতি।

রাসূল ﷺ বলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সাহাবাগণ জানতেনই না যে তিনি সোমবারে জন্মেছেন। মানুষের মাঝে তিনিই নিজের জন্মদিবস সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানতেন। তারপরও না তিনি বলে দিয়েছেন সেটা কোন মাসের কত তারিখের সোমবার,আর না সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুম) তা জানতে চেয়েছেন।

আর ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু) ক্যালেন্ডার গণনা শুরু করেছেন হিজরতের বছর থেকে। আহলে কিতাবরা যেরকম তাদের নবীর জন্মের বছর থেকে হিসাব শুরু করেছে, তেমনটা তিনি করেননি।

এসব বিষয় প্রমাণ করে আমরা পালা-পার্বণের জাতি নই, আমরা কাজ করনেওয়ালা জাতি।

অসহনীয় যন্ত্রণাও অনেকসময় লুকায়িত রহমত হয়ে থাকে।

অসহনীয় যন্ত্রণাও অনেক সময় লুকায়িত রহমত হয়ে থাকে। মারইয়াম (‘আলাইহাসসালাম) যন্ত্রণার কারণে মৃত্যু কামনা করেছিলেন।

“হায়! এর আগেই যদি আমার মৃত্যু হতো।” (সূরাহ মারইয়াম ১৯:২৩)

অথচ তাঁর গর্ভে ছিলেন একজন নবী যিনি মানুষের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন।

পথ চলতে শুরু করার আগেই পথের রুক্ষতা সম্পর্কে জেনে নিলে সতর্কতা ও ধৈর্য অবলম্বন সহজ হয়।

“তুমি যা নিয়ে এসেছো তার অনুরূপ বিষয় যারাই এর আগে নিয়ে এসেছিলো, তাদের সবার সাথেই বিরূপ আচরণ করা হয়েছিলো।” মুহাম্মাদের ﷺ নবুওয়্যাতের বিষয়ে জানতে পেরে শুরুর দিকেই এ কথা বলেছিলেন ওয়ারাক্বা বিন নওফল। পথ চলতে শুরু করার আগেই পথের রুক্ষতা সম্পর্কে জেনে নিলে সতর্কতা ও ধৈর্য অবলম্বন সহজ হয়।

হৃদয় হলো গাছের মতো— এতে নিয়মিত পানি না দিলে শুকিয়ে মরে যাবে।

বিরক্তি বা একঘেয়েমি উদ্রেক না করে সত্যকে বারবার বলতে থাকা উচিত। কুরআনের অনেক জায়গাতেই একই জিনিস একাধিকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়েছে। কারণ হৃদয় হলো গাছের মতো। এতে নিয়মিত পানি না দিলে তা শুকিয়ে মরে যাবে।

ইলম অর্জন না করে চিন্তাশীলতায় ডুবে থাকা যাবে না।

চিন্তাশীলতা নিজে কোনো জ্ঞান না। এটি হলো প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া। পথভ্রষ্ট হওয়ার একটি কারণ হলো কম জ্ঞানার্জন করে বেশি বেশি চিন্তা করা।

নিজেকে কোনো ব্যক্তির সাথে জুড়ে ফেলবেন না।

নিজেকে কোনো ব্যক্তির সাথে জুড়ে ফেলবেন না। সে যত উপরে উঠবে, ততই আপনি তাকে আঁকড়ে ধরবেন, তার পতন হলে আপনাকে নিয়েই সে মাটিতে আছড়ে পড়বে। আপনার পতনও ততই ব্যথাযুক্ত হবে।

নি'আমতের শোকর আদায় করলে তাতে বরকত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর না-শোকরি করলে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়।

আল্লাহর দেওয়া নি'আমতের শোকর আদায় করলে দুটি নি'আমত পাওয়া যায়। একটি হলো সেই নি'আমতটি স্থায়ী হওয়া, আরেকটি হলো সেটিতে বরকত লাভ করা (কল্যাণজনকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া)। নি'আমতের না-শোকরি করলে আল্লাহ সেই নি'আমত ছিনিয়ে নেন। আর যদি ছিনিয়ে না-ও নেন, তাহলে তার মধ্য থেকে বরকত উঠিয়ে নেন।

মানুষের মন জয় করার জন্য অকাট্য প্রমাণের সাথে কোমল আচরণও জরুরি।

শুধু অকাট্য প্রমাণ দিয়েই মানুষের মন জয় করা যায়না। এর জন্য কোমল আচরণও প্রয়োজন। নবীজীর ﷺ কাছে নবুওয়্যাতের প্রমাণ হিসেবে ছিলো কুরআন এবং তাঁর সাথী জিবরীল (আলাইহিসসালাম)। তারপরও তাঁকে বলা হয়েছে,

"এবং যদি তুমি রূঢ় মেজাজ ও কঠিন হৃদয় হতে, তবে অবশ্যই তারা তোমার নিকট হতে সরে যেতো।" (সূরাহ আলি 'ইমরান ৩:১৫৯)

নিজে হকের পক্ষে থেকেও সেটার পক্ষে দলিল পেশ করতে না পারলে বাতিলের সাথে বিতর্ক করবেন না।

শক্ত দলিল থাকার পরও সেটা ব্যবহার করতে না জানলে বাতিলপন্থী লোকদের সাথে বিতর্ক করবেন না। এটা সত্যের পরাজয়ের ভয়ে নয়, বরং আপনার নিজের উপকারার্থেই। তলোয়ার হাতে থাকা সত্ত্বেও মানুষ প্রতিপক্ষের লাঠির আঘাতে মারা যেতে পারে যদি সে তলোয়ার ব্যবহারের নিয়ম না জানে।

মক্কা, মদীনা আর ফিলিস্তিনকে রক্ষা করা কেন জরুরি?

মক্কা-মদীনার পর শ্রেষ্ঠতম স্থান হলো শামের ভূমি। এর অনেক ফযিলাত ওয়াহী দ্বারা সাব্যস্ত। শামের শ্রেষ্ঠ অংশ হলো ফিলিস্তিন। মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক অবস্থার কখনো উন্নতি হবে না যদি এই তিন স্থানের অবস্থা খারাপ থাকে।

দেহের সুস্থতার জন্য সঠিক ডাক্তার যেমন জরুরি, দ্বীন পালনের জন্য সঠিক আলেমের দিকনির্দেশনাও তেমন জরুরি।

দেহের সুস্থতার জন্য লোকে ঠিকই বুঝেশুনে দক্ষ ডাক্তার খোঁজে। কিন্তু দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে আলেমদের থেকে সঠিক মতটা খুঁজে নিতে গড়িমসি করে। ডাক্তারদের কাছ থেকে ভুলভাল ঔষধের অনুমোদন খুঁজলে দেহের ক্ষতি হয়। আর ফুক্বাহাগণের কাছ থেকে নিজের মনমতো মত খুঁজলে দ্বীনের ক্ষতি হয়।

গ্রহ-নক্ষত্রগুলো ঘুরতে ঘুরতে একই জায়গায় ফেরত আসে কিন্তু আযান শুনে মানুষ রবের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে আসে না।

গ্রহ-নক্ষত্রগুলোর চোখ-কান নেই। তবু তারা কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে ঠিকই নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট স্থানে ফিরে আসে। অথচ চোখ-কানওয়ালা মানুষ আযান শুনে নির্দিষ্ট সময় পরপর মসজিদে আসে না।

"এটি আল্লাহর সৃষ্টি নৈপুণ্য, যিনি সবকিছুকে করেছেন যথাযথ।" (সূরাহ আন-নামল ২৭:৮৮)

আসমানী পুরস্কার আসে বিপদের সমানুপাতে।

ইউসুফকে ('আলাইহিসসালাম) যদি কূয়ায় না ফেলা হতো, তাহলে না তাঁকে সেই অভিযাত্রী কাফেলার লোকেরা খুঁজে পেতো, না তাঁকে মিশরের আযীযের কাছে বিক্রি করতো, না তিনি বিচারের সম্মুখীন হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতেন, আর না শেষমেশ আল্লাহ তাঁকে মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতেন। আসমানী পুরস্কার আসে বিপদের সমানুপাতে। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাঁকে বিপদে পতিত করেন'। সুতরাং আল্লাহ আপনাকে বিপদে ফেললে ধৈর্যহারা হবেন না। আল্লাহ আপনাকে এর মাধ্যমে শীঘ্রই সম্মানিত করবেন।

প্রথমে দ্বীনের মৌলিক বিষয় মজবুত করে তারপরই শাখাগত বিষয়ে দাওয়াহ দিতে হবে।

ভিত্তিমূলে দুর্বলতা থাকাকালীন শাখাগত বিষয়ে বেশি ব্যস্ততা দেখালে ভিত্তি আরো দুর্বল হয়ে যায়। এজন্যই নবীজী ﷺ প্রথমে মৌলিক বিষয়াদির দাওয়াহ দিয়েছেন। তারপর ক্রমান্বয়ে শাখাগত বিষয়গুলো শিক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণ দ্বীনকে মজবুত করেছেন।

জ্ঞানী লোক কখনোই এমন অতীতের দিকে তাকাবে না যা তাকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে গাফেল করে দেয়।

চলার পথে কদম উঠিয়ে আগের পদক্ষেপের ছাপের দিকে তাকিয়ে না থেকে পরবর্তী কদমটি কোথায় পড়তে চলেছে সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। জ্ঞানী লোক কখনোই এমন অতীতের দিকে তাকাবে না যা তাকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে গাফেল করে দেয়।

যে আল্লাহকে সম্মান করে, সে ভক্ত অনুসারীর ফিতনায় পড়ে না।

ভক্ত অনুসারীরা হলো একটি ফিতনা। অনুসারী জুটে গেলে ইখলাস কমে যায়। পেছনে অনুসারী বাড়তে থাকলে বারবার পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে মানুষ নিজেই নিজের ভক্ত হয়ে যায়। যে আল্লাহকে সম্মান করে, সে এই বিপদে পড়ে না। যতক্ষণ তার সামনে আল্লাহ আছেন, ততক্ষণ সে পেছনের অনুসারী সংখ্যাকে পরোয়া করে না।

যার জ্ঞানের শিকড় শক্তভাবে প্রোথিত থাকে দমকা হাওয়ায় সেই টিকে থাকতে পারে।

যে একেকবার একেক মতাদর্শের মাঝে দোল খেতে থাকে, জ্ঞানের ভূমিতে আসলে তার কোনো শিকড় প্রোথিত নেই। এদের উদাহরণ হলো ভূমির উপর পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর খড়কুটোর মতো যা বাতাসের প্রথম ঝাপটাতেই ওলটপালট হয়ে যায়। কিন্তু যার জ্ঞানের শিকড় শক্তভাবে প্রোথিত থাকে দমকা হাওয়ায় সে ঠিকই টিকে থাকতে পারে।

কারবালার বিশেষ কোন ফযিলত নেই

হাদীস ও সাহাবাগণের জীবনী থেকে কারবালার কোনো বিশেষ ফযিলতের কথা জানা যায় না। বরং নবীজীর ﷺ যুগে কারবালা বলে কিছু ছিলোই না। কারবালার মর্যাদা সম্পর্কে যা পাওয়া যায় সবই রাফিদ্বা শিয়াদের বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী।

কাজ খুঁজে পাচ্ছে না এরকম বেকারকে সাহায্য করা তার ইসলামী অধিকার।

কাজ খুঁজে পাচ্ছে না এরকম বেকারকে সাহায্য করা তার ইসলামী অধিকার।

"যাদের ধন-সম্পদে একটা সুবিদিত অধিকার আছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের।" (সূরাহ আল-মাআরিজ ৭০:২৪-২৫)

অর্থাৎ, চাকরি থেকে বঞ্চিত। এখানে 'সুবিদিত অধিকার' কথাটা দিয়ে একে চিরন্তন বিধানে পরিণত করা হয়েছে।

যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্‌ তার দিকে অগ্রসর হন।

নি'য়ামাতের দরজাগুলো তার জন্যই খুলে দেওয়া হয়, যে সেগুলোতে ক্রমাগত কড়া নাড়ে। যে আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্‌ তার দিকে অগ্রসর হন। যে আল্লাহ্‌ থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহ্‌ তার থেকে বিমুখ হন।

"তোমরা মীমাংসা চাচ্ছিলে, মীমাংসা তো তোমাদের কাছে চলেই এসেছে।" (সূরাহ আল-আনফাল ৮:১৯)

অন্যের খারাপ দিক নিয়ে আনন্দিত হওয়ার আগে দেখুন তেমন খারাপ দিক আপনারও আছে কিনা।

যারা মানুষের মাঝে মন্দ কিছু চোখে পড়লে সেটা দেখে ঘৃণার ভাব করেন, তাদের উচিত নিজেদের মাঝেও একই অনুপাতের মন্দ খুঁজে বের করা। মানুষের ভুল দেখে তখন আর উৎফুল্ল হওয়া বা ঘৃণা করার স্বভাব থাকবে না। বরং তাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি জাগ্রত হবে।

বয়স্ক ব্যক্তির মতামত যুবকের চাক্ষুষ জ্ঞানের চেয়েও উত্তম।

যখন কোন সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকা বয়স্ক ব্যক্তির পরামর্শও ঘটনাস্থলে থাকা যুবকের মতামতের চেয়ে বেশি সঠিক হয়। কারণ বয়স্ক ব্যক্তির আছে অভিজ্ঞতা, যা ঘটনাস্থলে থাকা যুবকের নেই। আলী ইবনে আবু তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "বয়স্ক ব্যক্তির মতামত যুবকের চাক্ষুষ জ্ঞানের চেয়েও উত্তম।"

ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা হলো কেবলই আবেগ, যা সত্যকে চেনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে কারো মতাদর্শের অনুসারী হবেননা। ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা বা ঘৃণা হলো কেবলই আবেগ, যা সত্যকে চেনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারাই যারা সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারাই যারা সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে। বুদ্ধি যত লোপ পায়, লক্ষ্যও তত ঝাপসা হয়ে আসে। মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি যখন পানি পান করার জন্য একটি গ্লাস হাতে নেয়, তখন তার একটি লক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু পান করা শেষে গ্লাসটি কোথায় রাখতে হবে তা সে জানে না।

কোমলতা সর্বাবস্থায় সঠিক পন্থা নয়।

লাঠিকে সবসময় মাঝ বরাবর ধরা জায়েয নেই (অর্থাৎ, সবসময় কোমলতা ঠিক নয়)। কখনো এটাকে ভেঙে দুই টুকরো করা আবার কখনো এর আঘাতে কোনো কিছু ভেঙে চুরমার করাটাও ফরয হয়ে যায়।

আলেম আর মুজাহিদের মাঝে মজবুত সম্পর্ক।

মুজাহিদ যদি আলেমের অনুগত না হয়, আর আলেম যদি মুজাহিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে উম্মাহ পরাজিত হয়। সব আশা-ভরসা ভেস্তে গিয়ে জিহাদের চাকা এক জায়গায় ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই আলেম আর মুজাহিদের মাঝে গুরু-শিষ্যের মজবুত সম্পর্ক ছাড়া উম্মাহর মুক্তি সম্ভব নয়।

সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারার সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর একটি হলো সময়মতো সালাত আদায় করা।

মানুষের কটু কথা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সত্যের উপর অবিচল থাকতে পারার সবচেয়ে বড় মাধ্যমগুলোর একটি হলো সময়মতো সালাত আদায় করা।

“কাজেই তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো আর তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা (নিয়মিত) উচ্চারণ করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে।”
(সূরাহ ত্বা-হা ২০: ১৩০)

চরম দারিদ্র্য এবং অনটনের সময় অভাবগ্রস্তদের দান-সদকা করা নফল হাজ্জের থেকেও উত্তম।

চরম দারিদ্র্য এবং অনটনের সময় অভাবগ্রস্তদের দান-সদকা করা নফল হাজ্জের থেকেও উত্তম। এছাড়া তাদের মাঝে উদহিয়াহ (কুরবানীর গোশত) বিতরণ করা কোনো ধনী দেশে বিতরণ করার থেকেও উত্তম, যেমনটি আজ শাম, আরাকান, ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রে।

ভালো কাজের তুলনায় সৎ উদ্দেশ্যই আপনাকে সত্যের অধিক নিকটে নিয়ে যেতে পারে।

সত্য কথা থেকে নূর ঠিকরে বেরোয়। অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে এই নূর নিভে যায়। ভালো কাজের তুলনায় সৎ উদ্দেশ্যই আপনাকে সত্যের অধিক নিকটে নিয়ে যেতে পারে।

“আল্লাহ্ যদি তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ দেখতে পেতেন, তাহলে তাদেরকে (সত্য) শোনার সামর্থ্য দিতেন।” (সূরাহ্ আল-আনফাল ৮:২৩)

অন্তরের নিয়তকে শুদ্ধ করুন, আল্লাহ্ আপনার কাজকে শুদ্ধ করে দিবেন।

আল্লাহর সাথে আপনার গোপন সম্পর্ককে শক্তিশালী করুন।

যারা সত্যকে (ইসলাম পালন) ছেড়ে দেয়, তারা পূর্বের গোপন পাপগুলো করার অভ্যাসে ফিরে যায়। তাই আল্লাহর সাথে আপনার গোপন সম্পর্ককে শক্তিশালী করুন। তাহলে আল্লাহ আপনার বাহ্যিক আমলকেও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন।

ঐক্য হবে তাওহীদের উপর।

একটি জাতি যদি তাদের মৌলিক বিষয়েই ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, তাহলে আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারবেনা। উম্মাহ যদি তাওহীদের উপর ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে ‘গায়ে মুসলমানের রক্ত থাকা’র স্লোগান তুলে কোনো লাভ নেই।

বিদ’আতকে সমূলে উৎপাটন করতে করণীয়।

প্রতিপত্তি হলো অলীক আশার জমি যেখানে তার চাষ হয়। আর টাকা হলো তাতে সেচ দেওয়ার পানি। বিদ’আত ও ভ্রান্তিও এরকম জমি, পানি আর সেচদাতা ছাড়া নিজে নিজে বেড়ে ওঠে না। তাই বিদ’আতকে সমূলে উৎপাটন করতে তার জমিনে পানি আসা বন্ধ করতে হবে আর সেচদাতাদের রুখতে হবে।

নবীরাও তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে শিক্ষা নিয়েছেন।

বিভিন্ন জাতির ইতিহাস এবং তাদের অবস্থা নবীদের জন্যেও শিক্ষা, জ্ঞান এবং উপদেশের উৎস। “আমি তোমার পূর্বে যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করো (অর্থাৎ তাদের কিতাব দেখো ও তাদের অনুসারীদের নিকট যাচাই করো)।” (সূরাহ আয-যুখরুফ ৪৩:৪৫)

জ্ঞানী লোকের উচিত নিজের জ্ঞানের পরিধি না মেপে নিজের অজ্ঞতা পরিমাপ করা।

জ্ঞানী লোকের উচিত নিজের জ্ঞানের পরিধি না মেপে নিজের অজ্ঞতা পরিমাপ করা। যে নিজের অজ্ঞতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে, সে আরও শেখে। আর যে নিজের জ্ঞানের বহর নিয়ে ভাবনায় মেতে থাকে, সে অহংকারী হয়ে যায়।

খারাপ সময়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করা হলো নি'আমত, আর নি'আমত পেয়ে আল্লাহকে ভুলে গেলে সেটা আযাব।

মানুষকে বিপদ দিয়ে যেমন পরীক্ষা করা হয়, তেমনি নি'আমত দিয়েও পরীক্ষা করা হয়। খারাপ পরিস্থিতিতে পড়ে আল্লাহর দিকে রুজু হলে সেটি আসলে নি'আমত। আর নি'আমত পেয়ে আল্লাহকে ভুলে গেলে সেটি আসলে আযাব।

"আমি তোমাদেরকে ভালো ও মন্দ (উভয়টি দিয়ে এবং উভয় অবস্থায় ফেলে এর) দ্বারা পরীক্ষা করি।" (সূরাহ্ আল-আম্বিয়া ২১:৩৫)

না বুঝে মুঝস্থ করা বনাম মুখস্থ না করে বোঝার চেষ্টা করা

না বুঝে মুখস্থ করা হলো অজ্ঞতা ও অহমিকা। আর মুখস্থ না করে বোঝার চেষ্টা করা হলো অপূর্ণতা ও অভাব।

আমল ছাড়া ইলম হলো এক ধরনের শাস্তি।

আমল ছাড়া ইলম হলো এক ধরণের শাস্তি। কারণ জ্ঞানের তুলনায় কাজের পরিমাণ যত কমতে থাকে, ইবলীসের সাথে সাদৃশ্য তত বাড়তে থাকে। আর জ্ঞান অনুপাতে কর্ম বাড়লে নবীগণের সাথে সাদৃশ্য তৈরি হয়।

অধিক ভুল আসলে তারাই করে যারা ইতিহাসের ঘটনাসমূহের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না।

অধিক ভুল আসলে তারাই করে যারা ইতিহাসের ঘটনাসমূহের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে না। কারণ ইতিহাসের ঘটনাবলি একই প্রকৃতির, যদিও তারা কালের দিক দিয়ে ভিন্ন।

"তোমাদের পূর্বেও অনেক সম্প্রদায় গত হয়েছে,তোমরা দুনিয়া পর্যটন করো,তারপর দেখো, যারা মিথ্যা বলে অমান্য করেছিলো তাদের পরিণাম কী দাঁড়িয়েছে।" (সূরাহ আলি-ইমরান ৩: ১৩৭)

দুনিয়াবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কখনো অপরের সাথে নিজেকে তুলনা করবেন না।

দুনিয়াবি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কখনো অপরের সাথে নিজেকে তুলনা করবেন না। যদি নিজের প্রাপ্তি বেশি দেখতে পান, তাহলে অহংকারী হয়ে উঠবেন। আর যদি নিজের প্রাপ্তি কম দেখতে পান, তাহলে হিংসুটে হয়ে যাবেন।

"লোকটির উৎপাদন ছিলো প্রচুর। একদিন কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বললো, 'আমি সম্পদে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর জনবলে তোমার চেয়ে শক্তিশালী।' নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করলো।" (সূরাহ্ আল-কাহ্ফ ১৮: ৩৪-৩৫)

ভালো আর মন্দ দুই দলকে মিলিয়ে ফেললে মানুষ নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।

শাসক ন্যায়পরায়ণ হলেও তাকে ভালো ও মন্দ দুই দল উপদেশদাতা দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। শাসক যদি তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারে, তাহলে বেঁচে যাবে। আর যদি দুই দলকে মিলিয়ে ফেলে, তাহলে নিজেও বিপথগামী হবে আর অন্যদেরকেও বিপথগামী করবে। আল্লামা কিরমানি (রহঃ) বলেন, "প্রত্যেক নবী ও খলিফার সাথেই দুই দল উপদেশদাতা থাকে।"

মূর্খ আর জ্ঞানীর অবস্থা

অকাট্য বিষয় নিয়ে মূর্খের সাথে বিতর্ক করার চেয়ে মতপার্থক্যপূর্ণ বিষয়ে আলেমের সাথে বিতর্ক করা সহজ।

পরকালে আগুনে পুড়লে ইহকালের জনপ্রিয়তার কোনও দাম নেই।

ইহকালে মানুষ আপনার কথা সারাজীবন স্মরণ করলে কী লাভ যদি আপনি পরকালে সারাজীবন আগুনের অধিবাসী হয়ে যান?

ইতিহাস অধ্যয়ন করলে কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা অল্প সময়ে লাভ হয়।

বয়স বাড়লে অভিজ্ঞতা বাড়ে যা বাকি জীবনে কাজে লাগে। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা অল্প সময়ে লাভ হয়।

"আর তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের দৃষ্টান্ত।"

(সূরাহ আন-নূর ২৪:৩৪)

বিপদের সময় সবচেয়ে দুর্বল লোক হলো নিষ্কর্মা জ্ঞানী আর জ্ঞানহীন কর্মী।

ইলম মনকে বিশুদ্ধ করে, আর আমল রূহকে বিশুদ্ধ করে। বিপদের সময় সবচেয়ে দুর্বল লোক হলো নিষ্কর্মা জ্ঞানী আর জ্ঞানহীন কর্মী।

আপনি অন্যকে মাফ করলে আল্লাহও আপনাকে মাফ করে দেবেন।

আপনি অন্যের ভুলত্রুটি মাফ করে দিলে আল্লাহও আপনার গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং দোষ ঢেকে রাখবেন।

"তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করেও তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করোনা যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন?" (সূরাহ আন-নূর ২৪: ২২)

নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করেই অন্যদের সংশোধন করতে যাওয়া ব্যক্তিই সবচেয়ে বোকা।

নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা না করেই অন্যদের সংশোধন করতে যাওয়া ব্যক্তিই সবচেয়ে বোকা।

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো। তবে কি তোমরা বুঝো না?"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২: ৪৪)

প্রমাণ ছাড়া কুধারণা করা হারাম

প্রমাণ ছাড়া কুধারণা করা কিছু ক্ষেত্রে খুবই ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ্ একে পুরোপুরি হারাম করেছেন।

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা হতে বিরত থাকো। কতক ধারণা পাপের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরাহ্ আল-হুজুরাত ৪৯: ১২)

বিশাল জনগোষ্ঠীর পরাজিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো অন্তরের অমিল।

বিশাল জনগোষ্ঠীর পরাজিত হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো অন্তরের অমিল।

"পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ কোরো না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে।" (সূরাহ্ আল-আনফাল ৮:৪৬)

নি’আমতের জন্য আল্লাহর শোকরগুজার হলে তা অক্ষত থাকে, আর অকৃতজ্ঞতা দেখালে তা কেড়ে নেওয়া হয়।

আল্লাহ আপনার মর্যাদা উন্নত করলে আত্মহারা হবেন না। হতে পারে এই উত্থানই আপনার পতনের কারণ। নি’আমতের জন্য আল্লাহর শোকরগুজার হলে তা অক্ষত থাকে।

বছরের শুরু বা শেষে শুভেচ্ছা জানানোর কোন বিধান নেই

বছরের শুরু বা শেষের কোনো বিশেষ ফযিলত, আমল বা শুভেচ্ছার বিধান ইসলামে নেই। আর তাছাড়া নবীজীর ﷺ সময়ে এরকম কিছু ছিলোই না, বরং ইসলামী ক্যালেন্ডার গণনার নিয়ম উমারের (রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু) খিলাফাতকালে চালু করা হয়।

হাশরের মাঠে আপনি আপনার বছর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন, অন্য কোনোটির ব্যাপারে নয়।

প্রতিটি মানুষেরই নিজ নিজ বছর থাকে, যা শুরু হয় তার জন্মের সময় থেকে। এটিই তার সত্যিকার বয়স। মুহাররম (জানুয়ারি বা বৈশাখ) থেকে যে বছর শুরু হয়, তা সময় গণনার সুবিধার্থে বানানো নিয়ম। হাশরের মাঠে আপনি আপনার বছর সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন, অন্য কোনোটির ব্যাপারে নয়।

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমস্যা থাকলে উম্মাহ পথ চলতে পারে না।

উম্মাহ যদি চলার পথে হোঁচট খায়, তাহলে বুঝতে হবে এর মাথা অসুস্থ (নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা)।

নসীহতদাতার ব্যাপারে কুধারণা রাখা যাবে না।

যাকে নসিহত করা হচ্ছে, সে যদি নসিহতকারীর ব্যাপারে মনে মনে কুধারণা পোষণ করে, তাহলে তার পক্ষে নসিহত গ্রহণ করাই সম্ভব হবেনা।

দেহের ব্যাপারে মাথার উদাসীনতা কোন জাতির পতনের কারণ।

কোনো জাতির পতনের কারণ নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে একটি মাত্র মূল কারণ পাওয়া যায়, আর তা হলো দেহের ব্যাপারে মাথার উদাসীনতা। কাজের সময় হয় মাথা অন্যমনস্ক থাকে আর নয়তো এর অস্তিত্বই থাকে না। ফলে মাথা একসময় দেহ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মতপার্থক্যের প্রতি উদারতা বাড়ে ইলমের অনুপাতে।

ব্যক্তির ইলম যত বাড়ে, বৈধ মতপার্থক্যের প্রতি তার উদারতা তত বাড়ে। আর ইলম সংকীর্ণ হলে উদারতাও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

আপনি মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।

মৃত্যু থেকে পালাতে নেই, বরং এর জন্যে প্রস্তুতি নিতে হয়। মানুষ ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অথচ ভাবছে সে পালিয়ে বাঁচতে পারবে।

“যদি তোমরা মৃত্যু থেকে পলায়ন করতে চাও, তাহলে তা তোমাদের কোনোই উপকারে আসবে না।” (সূরাহ আহযাব ৩৩:১৬)

“যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নের চেষ্টা করো, নিশ্চয়ই তা তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছবেই।” (সূরাহ আল-জুমু’আহ ৬২:৮)

কোন জাতির পতনের শুরু হয় মুনাফিকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মাধ্যমে।

আমি ত্রিশটি জাতি ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের পতনের কারণ গবেষণা করেছি। তাদের পতনের শুরু হয়েছিলো নিজেদের মধ্যকার মুনাফিকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। তারপর বহিঃশত্রুরা এদের দুর্বলতা টের পেয়ে আক্রমণ করে বসে।

নি’আমত পেয়ে তা সংরক্ষণের শর্ত হলো কৃতজ্ঞ হওয়া।

আল্লাহ্ আপনার মর্যাদা উন্নীত করলে বিভ্রান্ত হবেন না। হতে পারে তিনি আপনার পতন তরান্বিত করতেই এমনটি করেছেন। নি’আমত পেয়ে তা সংরক্ষণ করার উপায় হলো কৃতজ্ঞ হওয়া। আর মানুষ যখন অকৃতজ্ঞ হয় আল্লাহ সেই নি’আমত ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে অপদস্ত করেন।

হৃদয়ের যথাযথ ব্যবহার করুন।

মানুষের একটাই হৃদয় থাকে। একে সৃষ্টির প্রতি অতিরিক্ত ব্যস্ত রাখলে স্রষ্টার দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগই পাবে না।

মানুষের ভালোবাসা হারানোর ভয়ে সত্য পরিত্যাগ করা যাবে না।

নমনীয় হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাই বলে মানুষের ভালোবাসা হারানোর ভয়ে সত্য পরিত্যাগ করা যাবে না। নবীজী ﷺ বলেন,

“কোনো লোকের ব্যাপারে বলা হবে, ‘সে কতই না জ্ঞানী, নম্র ও শক্তিশালী!’ অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।”

(বুখারি: ৬১৩২, মুসলিম: ৩৮৪)

ক্ষমতাশালীকে তেল মারলেই বিজয় আসে না।

বিজয় ও ক্ষমতা আসে দুর্বলকে সাহায্য করার মাধ্যমে, ক্ষমতাশালীকে তেল মারার মাধ্যমে নয়। হাদীসে এসেছে,

"তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের কারণেই তোমাদের বিজয় ও রিযিক দেওয়া হয়।"
(বুখারি: ২৭৩৯)

হাজারটা অন্তরে আবেগ তৈরি না করে, অন্তত একটি অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন।

হাজারটা অন্তরে আবেগী জজবা তৈরি না করে একটি অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ভালো। অন্তর অবিচল থাকে, আবেগ মরে যায়। হাজারটা দোদুল্যমান কর্মীর চেয়ে একজন দৃঢ়পদ কর্মীই উত্তম।

যে নি'আমত বান্দাকে আল্লাহর কাছে টানে না, সেটি এক চলমান শাস্তি।

যে নি'আমত বান্দাকে আল্লাহর কাছে টানেনা, সেটি এক চলমান শাস্তি। এর শুরুতে থাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চনা, আর শেষে থাকে অকল্যাণমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া।

কুরআনে বর্ণিত মধ্যমপন্থা।

কুরআনে বর্ণিত মধ্যমপন্থা—

"সেভাবে সুদৃঢ় হয়ে থাকো, যেভাবে আল্লাহ তোমাকে আদেশ দিয়েছেন।"
(সূরাহ হূদ ১১: ১১২)

অতএব এ পথে চলতে গিয়ে খুব বেশি ডানে ঝুঁকে পড়বেন না।

"আর সীমালঙ্ঘন কোরো না।" (সূরাহ হূদ ১১: ১১২)

আর শত্রুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চরম বামেও যাবেন না।

"তোমরা জালিমদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।" (সূরাহ হূদ ১১: ১১৩)

শহীদের লাশ বিকৃত করা হলে তার ছবি প্রকাশ করা উচিত নয়।

শহীদের লাশকে বিকৃত করা না হয়ে থাকলে তার ছবি প্রকাশ করা জায়েয। কিন্তু তার লাশকে বিকৃত করা হলে ছবি দেখানো মাকরুহ। কারণ এতে তার পরিবার কষ্ট পেতে পারে। সাফিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহুআনহা) হামযার (রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু) লাশ দেখুক এটি রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি।

অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকলে অন্য কোন কিছু সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।

অন্তর হলো পানির পাত্রের মতো। আল্লাহর প্রতি ভয় দিয়ে যদি এটি পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে অন্য কিছু ঢুকতে চাইলেও উপচে পড়ে যাবে।

জাতিগতভাবে শক্তিশালী হতে হলে বহিঃশত্রুকে চিনতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহ দূর করতে হবে।

দুটি কাজ না করলে কোনো জাতিই শক্তিশালী হতে পারবে না।

—বহিঃশত্রুকে চেনা

—অন্তর্কলহ দমন করা।

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যেসব লোক তার সঙ্গে আছে (সাহাবা), তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়ার্দ্র।” (সূরাহ আল-ফাতহ ৪৮:২৯)

নিজেদেরকে বিচারের ঊর্ধ্বে ভাবাটা ফিতনা ও অত্যন্ত গর্হিত মনোভাব।

আল্লাহ্‌র পথে লড়াইরত ব্যক্তিদের মধ্যে কলহ বেঁধে গেলে, নিরপেক্ষ বিচারকের অধীনে শারি'য়াহ অনুযায়ী বিচারের শরণাপন্ন হওয়া তাদের উপর ফরয। নিজেদেরকে বিচারের ঊর্ধ্বে ভাবাটা ফিতনা এবং অত্যন্ত গর্হিত মনোভাব। যারা এভাবে নিজেদের মধ্যকার কলহ দূর করে সমাধানে আসতে অস্বীকৃতি জানায়, তারা যালিম। তাদের অধীনে জিহাদ করা হারাম।

ভক্ত-অনুসারীর ফিতনা শাসকের ফিতনার চেয়ে ভয়ঙ্কর।

ভক্ত-অনুসারীর ফিতনা শাসকের ফিতনার চেয়ে ভয়ংকর। দ্বিতীয়টার থেকে পালিয়ে গিয়ে অনেকেই প্রথমটিতে পড়ে যায়।

তাড়াহুড়া প্রবণতা কোনকিছুর স্থায়ী রূপ দিতে পারে না।

তাড়াহুড়া করে তৈরি করা কাঠামো ভঙ্গুর হবেই। ধাপে ধাপে না ভেবে হুট করে মাথায় আসা চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়না। আর প্রাথমিক ধাপগুলো অতিক্রম না করেই ক্ষমতার চূড়ায় উঠে যাওয়া ব্যক্তির শীঘ্রই পতন ঘটবে। খসে পড়া তারাগুলোই বেশি জ্বলজ্বলে দেখায়।

শীতে অসহায় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।

দুটি শত্রু শামের জনগণের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। একটি হলো স্বৈরাচারী যালিম, আরেকটি হলো প্রচণ্ড শীত। প্রথমটিকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করতে হয়, দ্বিতীয়টিকে কাপড় দিয়ে। অতএব, সে অনুযায়ী সাহায্য পাঠান। উমার বিন খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহুআনহু) বলেন, “শীত হলো শত্রু। অতএব, এর বিরুদ্ধে সাজসজ্জা প্রস্তুত করো।” (লাতায়িফুল মায়ারিফ, ২/১৫৫)

আপনি যেটা মনে করেন সেটা মধ্যপন্থা নয়, মধ্যপন্থা আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আপনি যেটা মনে করেন, সেটা মধ্যমপন্থা নয়। বরং আল্লাহ্ এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্র হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমেই সঠিক মধপন্থা অবলম্বন সম্ভব। আল্লাহ্ বলেন,

“আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত করেছি।” (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ ২:১৪৩)

সৌন্দর্যের কারণে লক্ষ টাকায় পশু বিক্রি করাটা জাহিলিয়াতের নতুন রূপ।

কুরবানী উপলক্ষ্যে পশুর বাজারে সৌন্দর্যের কারণে অনেক গরু, উটের জন্য লক্ষ টাকা দাম হাঁকা হয়। এভাবে স্রেফ সৌন্দর্যের কারণে লক্ষ টাকায় পশু বিক্রি করাটা জাহিলিয়াতের নতুন রূপ।

অসহায় উম্মতের সাহায্য না করার জন্য আমাদের ঘাড়ে পাপের যে বোঝা, তার ভার ভয়াবহ হবে।

শামের নারী-পুরুষেরা যখন আব্রু ঢাকার জন্য একটি দিনারের জন্য হাহাকার করে, তখন আমাদের পৌরুষ নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। আমাদের গুনাহের পরিমাণের কথা ভেবে ভয় পাওয়া উচিত।

মিথ্যার পক্ষে তর্ক করলে আল্লাহ্র বিরাগভাজন হতে হয়।

কিছু কিছু তর্ক চালিয়ে যাওয়া হয় শুধু নফসকে খুশি করতে। মিথ্যার পক্ষে যারা তর্ক করে তারা আল্লাহর অপছন্দের লোক। নবীজী ﷺ বলেন, “কেউ যদি জেনেশুনে মিথ্যা ব্যাপারে তর্ক করে, তাহলে সে এ কাজ থেকে বিরত হওয়ার আগ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার প্রতি নারাজ থাকেন।”

আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর জমে থাকা।

লোকে যদি আপনাকে খুব করে সরে আসতেও বলে, তবুও দাঁতে দাঁত চেপে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের উপর শক্ত হয়ে জমে থাকুন।

জ্ঞানী লোকেরা ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে।

রশি যখন পেঁচিয়ে যায়, অজ্ঞ লোকেরা সেটা খুলতে গিয়ে ধৈর্য হারায় আর তা কেটে ফেলে। জ্ঞানবানরা ঠান্ডা মাথায় প্যাঁচ খুলে নেয়।

গোপন গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাওয়া অধিক ভয়ঙ্কর।

প্রকাশ্য গুনাহ করে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে অন্তরের গোপন গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাওয়া বেশি ভয়াবহ। হাদীসে আছে, “প্রকাশ্য গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাওয়া রিয়ার (লোক দেখানো) কারণে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে কম গুরুতর।”

আবেগের বশে কারো অনুসরণ পরে আফসোসের কারণ হতে পারে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অমুক-তমুক ব্যক্তিকে অনুসরণ করা হয় আবেগ আর ঝোঁকের বশে। আবেগ কেটে গেলে পরে তা আফসোসের কারণ হয়।

“স্মরণ করো,যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, তারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে, তারা শাস্তি দেখবে আর তাদের মধ্যকার যাবতীয় সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে যাবে।” (সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ্ ২:১৬৬)

মানুষের ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয় আর আল্লাহর শরি’আতের প্রশংসা করতে হয়।

মুজাহিদদের ভুলের কারণে জিহাদের নিন্দা করা আর মুসল্লীদের ভুলের কারণে সালাতের নিন্দা করা একই কথা। মানুষের ত্রুটি সংশোধন করে দিতে হয় আর আল্লাহর শারি’আতের প্রশংসা করতে হয়।

সমালোচনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কোন মুসলিম যখন সত্য থেকে বিচ্যুত হয় তখন তার সমালোচনায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা উচিত। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে কোনো ব্যক্তির ভুলত্রুটির সমালোচনা করলে সেই ব্যক্তির ভুল থেকে দ্বীনকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু ব্যক্তির সমালোচনা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করলে মানুষ ভয় পেয়ে সত্য থেকেই পলায়ন করবে। কারণ সত্য যদি তার অনুসারীদেরই সংশোধন করতে না পারে,তাহলে তা আদৌ সত্য নয়।

দৃঢ়তা ও অবিচলতা ছাড়া সত্যের কোনো মূল্য নেই।

মিথ্যা বলার চেয়ে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা বেশি ক্ষতিকর। সত্যের পক্ষে কথা বলার জন্য হিম্মত লাগে। আর দৃঢ়তা ও অবিচলতা ছাড়া সত্যের কোনো মূল্য নেই।

"আর আমি যদি তোমাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত না রাখতাম, তাহলে তুমি তাদের দিকে কিছু না কিছু ঝুঁকেই পড়তে।" (সূরাহ আল-ইসরা ১৭:৭৪)

আত্মীয়দেরকে উপহার দেওয়া অনাত্মীয়দেরকে দান করা থেকে উত্তম।

আত্মীয়দেরকে উপহার দেওয়া অনাত্মীয়দেরকে দান করা থেকে উত্তম। নবীজীর ﷺ স্ত্রী মায়মুনা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) একটি দাসীকে মুক্ত করেন। নবীজী তাঁকে বললেন, "তুমি যদি তাকে তোমার মামাদের কাছে উপহারস্বরূপ দিতে, তাহলে বেশি সাওয়াব পেতে।"

চরিত্রই মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

উত্তম চরিত্রের মালিক হওয়া সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হওয়ার চেয়ে ভালো। নবীজী ﷺ বলেছেন, "তুমি লোকদেরকে সম্পদ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। বরং তাদেরকে তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও সুন্দর চরিত্র দিয়ে সন্তুষ্ট করো।"

(মুস্তাদরাক হাকিম: ৪২৭)

ক্ষমা আসে তাক্বওয়া থেকে।

যারা মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি ক্ষমার হাত প্রসারিত করে, তারাই সবচেয়ে তাক্বওয়াবান। আর যারা ক্ষমা করতে জানে না, তাদের অন্তর কঠিন আর তারা ঈমানেও দুর্বল।

"বস্তুতঃ ক্ষমা করাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী।"

(সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২:২৩৭)

সত্যের পথে চলতে গিয়ে যদি বিপদ আসে, তাহলে সবর করতে হবে।

আল্লাহ মানুষকে বিপদ খুঁজতে বলেননি, সত্যের অনুসন্ধান করতে বলেছেন। কারণ বিপদ-আপদ তো কাফিরের উপরও আসে। কিন্তু সত্যের পথে চলতে গিয়ে যদি বিপদ আসে, তাহলে সবর করতে হবে। আর আল্লাহ সে বিপদ সরিয়ে দিলে শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

সবচেয়ে ক্ষতিকর লোক হলো যারা শুধু প্রশংসা করে, উপদেশ দেয় না।

আপনার জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর লোক হলো তারা যারা আপনার অতিরিক্ত প্রশংসা করে, কিন্তু দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য কখনো উপদেশ দেয় না।

দ্বীনকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে আলাদা করলে অপমানিত হতে হবে।

যারা মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে সত্য দ্বীন ইসলামকে পৃথক করে, আল্লাহ তাদেরকে চরমভাবে অপমানিত করেন। এমনকি খ্রিষ্টানদের মিথ্যা ধর্মকে যারা বৈষয়িক জীবন থেকে পৃথক করেছে তাদেরকেও এমন অপমানিত করা হবে না, যেমনটা সত্য দ্বীন ইসলামকে যারা জীবন থেকে আলাদা করে তাদেরকে করা হবে।

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস করো? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জিবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনোই পথ নেই।” (সুরাহ আল-বাক্বারাহ ২:২৮৫)

ঠাট্টা-মশকরায় কোনো ফায়দা নেই।

ঠাট্টা-মশকরায় কোনো ফায়দা নেই। এর ফলে বরং বাস্তবতার জ্ঞান লোপ পায়।

“কিন্তু তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে, এমনকি তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলো। তোমরা তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে।”
(সূরাহ আল-মু’মিনুন ২৩:১১০)

যে মানুষের দোষ বলে বেড়ায়, আল্লাহও তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন।

আল্লাহ একজনের অনেক গুনাহ গোপন রেখে আরেকজনের অল্প গুনাহ প্রকাশ করে দিতে পারেন। কারণ প্রথমজন মানুষের গুনাহ গোপন রাখে, তাই আল্লাহ তার দোষ গোপন করেন। আর দ্বিতীয়জন মানুষের দোষ প্রচার করে বেড়ায়, তাই আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দেন।

কারো কাঁধে ভর দিয়ে থাকবেন না, যদিও সে আপনাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

কারো কাঁধে ভর দিয়ে থাকবেন না, যদিও সে আপনাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কারণ সে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে নত হয়, আপনাকেও তার সাথে নত হতে হবে।

প্রশংসার লোভ বা নিন্দার ভয়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন না

সত্য হলো সরল পথ। প্রশংসার লোভ বা নিন্দার ভয়ে সত্য থেকে বিচ্যুত হবেন না। কারণ অর্থহীন প্রশংসা বা নিন্দা কেবলই ফাঁকা আওয়াজ। অর্থহীন আওয়াজ করে গরু-ছাগল তাড়ানো হয়। মানুষের মনকে সত্যের পথে পরিচালিত করতে হয় প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার দ্বারা।

আপনি মুখে আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করলে কাজকেও আল্লাহর দিকে ধাবিত করতে পারবেন।

কথা ও কাজ মহৎ ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই বলা বা করা হয়। আপনি মুখে আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করলে কাজকেও আল্লাহর দিকে ধাবিত করতে পারবেন। আর মানুষের বড়ত্ব ঘোষণা করে বেড়ালে মানুষের উদ্দেশ্যেই কাজ করবেন। অন্তর মহত্ব ঘোষণা করে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সে অনুযায়ী কাজ করে।

নফস হলো দাঁড়িপাল্লার মতো। একদিকে ঝুঁকে গেলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

নিজের জন্য উপকারী জিনিসকে যে চিনতে পারে না, সে নিজের জন্য অপকারী জিনিসও চিনবে না। যে নিজের প্রতি ইনসাফ করে না, সে আল্লাহর (হুকুমের) প্রতিও ইনসাফ করবে না। নফস হলো দাঁড়িপাল্লার মতো। এটি একদিকে ঝুঁকে গেলেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মানুষের উচিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নেওয়া।

নক্ষত্র যেভাবে কক্ষপথে ঘোরে, কোনো জাতির মধ্যে ঘটনাবলিও সেভাবে **ঘোরে**। নির্দিষ্ট সময় পরপর এগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে। জ্যোতির্বিদ যেভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের চলাচল দেখে শিক্ষা নেয়, মানুষেরও উচিত এসব ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কিন্তু মানুষ এগুলোকে বড় অবহেলা করে।

সত্যের উপর অটল থাকার জন্য প্রয়োজন সাহস ও ধৈর্য।

নফস যদি মিথ্যাকে শুষে নেয়, তাহলে তা সত্য গ্রহণে অনীহা দেখায় আর এর প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ করে। তাই সত্যের উপর অটল থাকার জন্য প্রয়োজন সাহস ও ধৈর্য। রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ করো।" সে বললো, "আমার অনীহা লাগছে।" তিনি জবাব দিলেন, "অনীহা বোধ হলেও ইসলাম গ্রহণ করো।" (মুসনাদ আহমাদ)

আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়ের জন্য দু'আ করার আগে ইস্তিগফার করা জরুরি।

মানুষের গুনাহের কারণে আল্লাহ্র বিজয় ও সাহায্য বিলম্বিত হয়। তাই বিজয়ের জন্য দু'আ করার আগে ইস্তিগফার করা জরুরি। "হে আমাদের রব্ব! আমাদের পাপ ও সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করে দিন, আমাদের পা দৃঢ় করে দিন, আর আমাদেরকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করুন।" (সূরাহ্ আল 'ইমরান ৩: ১৪৭)

বন্ধু আর শত্রু চেনার উপায়।

বিপদের সময়ে যে আপনাকে সতর্ক করে আর দৃঢ় রাখতে যায়, সে-ই আপনার বন্ধু। আর যে আপনাকে মিথ্যা নিরাপত্তার আশা দেখিয়ে অলস বানিয়ে দেয়, সে-ই আসল শত্রু।

বিপদের মাধ্যমেই আল্লাহ্ কল্যাণ বের হরে আনেন।

বিপদের মধ্য থেকেও আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য কল্যাণ বের করে আনেন। ‘আয়িশাকে (রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহা) অপবাদ দেওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে আর সত্যবাদীদের পরীক্ষা করা হয়েছে।

“যারা এ অপবাদ উত্থাপন করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমাদের জন্য ক্ষতিকর মনে কোরো না, বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।” (সূরাহ আন-নূর ২৪:১১)

আল্লাহকে যে ভয় করে না, আপনি তার থেকে নিরাপদ নন।

আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় গিয়ে যারা থেমে যায় না, তারা আপনার আদেশ-নিষেধেরও তোয়াক্কা করবে না। আর আল্লাহকে যে ভয় করে না, আপনি তার থেকে নিরাপদ নন।

“আর যদি তারা তোমার সাথে খিয়ানত করার ইচ্ছা করে, তাহলে তো পূর্বেও তারা আল্লাহর সাথে খিয়ানত করেছে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে তোমার অধীন করে দিয়েছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে বিশেষভাবে অবগত, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান।” (সূরাহ আল-আনফাল ৮:৭১)

তাওহীদের উপর একত্রিত হওয়া বেশি জরুরি।

সম্পদ, ভূমি কিংবা রাজনীতির ওপর একত্রিত হবার চেয়ে কালিমা তাওহীদের উপর একত্রিত হওয়াই দেশসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক, গৌরবজনক ও সবচেয়ে বেশি নিরাপদ।

“এবং একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে একসাথে আঁকড়ে থাকো।”
(সূরাহ আল-‘ইমরান ৩:১০৩)

আল্লাহর রজ্জু বলতে তাওহীদকে বোঝানো হয়েছে।

শাইখ পরিচিতি

শাইখের নাম আবদুল আযীয বিন মারযুক্ব আত-তারিফী। ৭/১২/১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ৭/৯/১৯৭৬ সালে কুয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইউনিভার্সিটির শারি'আহ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট করেন। কর্মজীবনে তিনি প্রথমে মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার্সের গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে সেন্টার ফর রিসার্চ স্টাডিজের গবেষণা পরিচালক ও তারপর একই প্রতিষ্ঠানের ইসলামী গবেষকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৩ বছর বয়সে তিনি ইসলামী শাস্ত্রের কিতাবাদি মুখস্থ করা শুরু করেন। এর মধ্যে প্রথম হলো হাদীস শাস্ত্রের কিতাব আল-বাইক্বুনিয়্যাহ। তারপর ১৮ বছর বয়সের মধ্যে তিনি কাশফুশ শুবুহাত, কিতাবুত তাওহীদ, ফাদ্বলুল ইসলাম, আলমানযুমাতুর রাহবিয়্যাহ, বুলুগুল মারাম কিতাবের পাশাপাশি শত শত চরণের কবিতা মুখস্থ করেন। তারপর তিনি সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবি দাউদসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাব মুখস্থ করেন। এছাড়াও তিনি মানারুস সাবতী এবং মালিকি মাযহাবের আর-রিসালাহ (ইবনে আবি যায়দ আল-ক্বাইরাওয়ানি রচিত) মুখস্থ করেন।

হাদীস, ফিক্বহ, উসুল, তাফসির, আদাব (সাহিত্য) এবং চার মাযহাবের অসংখ্য কিতাব তিনি অধ্যয়ন করেছেন। হাদীসের কিতাবের মাঝে উল্লেখযোগ্য সুনানুল বায়হাক্বি, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফ 'আব্দুর রাযযাক্ব, সুনান দারাক্বুতনি ইত্যাদি। অন্যান্য কিতাবের মধ্যে আছে ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ, যাদুল মা'আদ,

তাফসির ইবনে কাসির, তাফসির আত-তাবারি, তাফসিরুল বাগাওয়ি, তাফসির আয-যামাখশারি, তাফসির আস-সা'লাবি, সিরাত ইবনে হিশাম এবং আল-মুগনি।

শাইখ প্রতিদিন গড়ে ১৩-১৪ ঘণ্টা পড়ালেখা করেন এবং প্রতিদিন ৩০ থেকে ৫০টি হাদীস মুখস্থ করতেন।

শাইখের শিক্ষকগণের মাঝে উল্লেখযোগ্য:

শাইখ 'আব্দুল 'আযিয বিন বায, শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরী, শাইখ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আক্কি, শাইখ 'আব্দিল কারিম আল-খুদাইর, শাইখ সালিহ আলুশশাইখ ও শাইখ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ আস-সুমাইত।

আরো তথ্য জানতে ভিজিট করুন শাইখের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট:

http://www.altarefe.com/

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ